দৈনিক বজ্রশক্তি
সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
ঈদ সংখ্যা

সংকলন

রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৬।
আষাঢ় ১৪২২ । জুন ২০১৫।
রমযান ১৪৩৬ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে আদর্শিক লড়াইয়ের বিকল্প নেই

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, মাননীয় এমাম, হেযবুত তওহীদ।

সম্পাদকীয়

জাতীয় সংকট মোকাবেলায় গণমানুষের অংশগ্রহণ আবশ্যক

বছর ঘুরে যেমন ঈদ আসে আনন্দ, বিনোদন আর কিছু অবসর মুহূর্তের বার্তা নিয়ে। আর বাকিটা বছর আমাদেরকে কাটাতে হয় চরম অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে। প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থা মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে এতটাই অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে যে সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্রতি চরম বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছেন। রাজনীতিক দাঙ্গা প্রায়ই আমাদের দেশকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, উন্নয়ন-অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা শক্তিপ্রয়োগ করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান আসছে না। দেশের সম্পদ, দেশের মানুষের প্রাণকে জিম্মি করে পরিচালিত হচ্ছে অপরাজনীতিক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। এই বিপর্যয় ঘটানোর কাজে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার করা হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। তাদের ঈমানী চেতনাকে একটি ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বারবার ভুল খাতে প্রবাহিত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে এবং দেশে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অপরাজনীতি তথা জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে। কেউ তাদের অন্যায়ে প্রতিবাদ করলেই তাকে কাফের, নাস্তিক বলে ফতোয়া দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। মানুষ তাদের লেবাস, সুরত ও সুরে বিভ্রান্ত হয়। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না যে, এদের কথা ও কাজ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

একটি সমাজ যখন অন্যায় অশান্তিময় হয় তখন সেই সমাজকে শান্তিময় করা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সম্ভব হয় না, তখন নিজের স্বার্থ না ভেবে জাতির জন্য ভূমিকা রাখা সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দেশের মহাসংকটে আপামর জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে আমরা বলছি, এই অশান্তি থেকে মুক্তির পথ আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে দান করেছেন। কীভাবে আমাদের সমাজ শান্তিময় হবে, কীভাবে দেশের মানুষ চরিত্রে ও সম্পদে সমৃদ্ধ হবে সে উপায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা বলছি, জাতীয় সমৃদ্ধির পূর্ব শর্ত হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। সেটা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আগে জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ধর্ম ও রাজনীতির এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা সর্বতো উপায়ে কাজ করছি। পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি দেশব্যাপী এ পর্যন্ত আমরা পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি পথসভা, জনসভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, গোলটেবিল বৈঠক, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করেছি। আমাদের এ উদ্যোগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সাংসদ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সর্বশ্রেণির লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের প্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শপথ নিয়েছেন।

এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, শুধু শক্তি দিয়ে ধর্মের অপব্যবহারকারীদেরকে নির্মূল করা যায় না, এতে ফল উল্টো হয়। এজন্য প্রয়োজন বিকল্প ও সঠিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা; আল্লাহর দয়ায় আমাদের কাছে অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও ধর্মব্যবসার অসারতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি ও ইসলামিক দলিল রয়েছে যা সাধারণ মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন (ঈড়হারহপব) করতে সক্ষম হচ্ছে। সুতরাং জাতিকে এ অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে ধর্মব্যবসায়ীদের বিকৃত ধ্যান-ধারণা ও মতবাদের বিপরীতে আমাদের কাছে থাকা প্রকৃত, যৌক্তিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রচার দেশ ও মানুষের কল্যাণার্থে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, মানবতার কল্যাণ সাধনই হচ্ছে প্রকৃত এবাদত। ভোগবাদী জীবন দর্শনে অভ্যস্ত এবং বস্তুবাদী সভ্যতার আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজের মানুষ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকে। তাদের নীরবতা ও অনৈক্যের সুযোগে স্বার্থান্বেষীরা দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এখনো যদি দেশের সকল নাগরিক যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য। এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য তাদেরকে ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সবাইকে বুঝতে হবে যে, রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়া যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি মানুষ যেন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে, নির্ভয়ে পথ চলতে পারে এমন অবস্থা সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করাও মহত্তম এবাদত। এই এবাদত না করে যতই ব্যক্তিগত উপাসনা করা হোক সেটা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। পাশাপাশি সমাজ ও দেশের ঋণ পরিশোধের চিন্তাও আমাদের থাকতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ষোল কোটি মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হলে আমরাও পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানিত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারব এই আশাবাদকে সামনে রেখেই পবিত্র ঈদুল ফিতরের সংকলনটি প্রকাশ করা হলো।

সূচিপত্র

- *অধরাই রয়ে গেছে শ্রমিকের অধিকার-২*
- *জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব- ৪*
- *সমাজের ধ্বংস, প্রচলিত ব্যবস্থার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী!- ৮*
- *প্রকৃত সাম্যবাদীরা আসুন পথ পাওয়া গেছে-৯*
- *মৌনতাই আলেমদের বর্তমান হীনতার কারণ-১১*
- *ইসলাম শিক্ষার নামে যা হচ্ছে- ১৩*
- *জান্নাতি ফেরকা: মৃত জাতির আশার আলো- ১৪*
- *ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড- ১৬*
- *হেযবুত তওহীদের বালাগ-১৯ দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত 'ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান' শীর্ষক আলোচনা সভার খণ্ডচিত্র-২৪*
- *তওহীদ জান্নাতের চাবি-২৬*
- *নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য- ২৯*
- *একটি জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয় কখন?- ৩১*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টাগুলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

উপাসনা ও ধর্মের পার্থক্য

মনিরুজ্জামান

ধর্ম ও ধারণ একই শব্দ থেকে এসেছে। যে গুণ বা বৈশিষ্ট ধারণ করে কোনো বস্তু তার স্বকীয়তা, নিজস্বতা পায় তাকেই ঐ বস্তুর ধর্ম বলে। যেমন একটি লৌহদণ্ড আকর্ষণ করার গুণ ধারণ করে চুম্বকে পরিণত হয়। এই আকর্ষণ করার গুণটিই হলো ঐ চুম্বকের ধর্ম। যদি কোনো কারণে চুম্বক তার ধর্ম তথা আকর্ষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তবে সেটি পুনরায় লৌহে পরিণত হয়, সেটি আর চুম্বক থাকে না। একটি লৌহকে চুম্বকে পরিণত করতে হলে নিরন্তর তাকে চুম্বক দিয়ে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ঘর্ষণ করতে হয়, এটি চুম্বকের ধর্ম প্রাপ্ত করার প্রক্রিয়া। আবার পরিপূর্ণ চুম্বকও যদি আগুনে পোড়ানো যায় তবে সে তার ধর্ম হারিয়ে সাধারণ পদার্থে পরিণত হয়।

পানির ধর্ম হলো সে নিজে পবিত্র এবং সমস্ত কিছুকে ধৌত করে পবিত্র করে দেয়, তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা দূর করে নতুন জীবন দান করে। কিন্তু পানি যদি অপবিত্র, বিষাক্ত হয়ে যায় তবে সে অন্যকে না পবিত্র করতে পারে, না কারো তৃষ্ণা দূর করতে পারে। পানিকে পবিত্র করার জন্য, বিষমুক্ত করার জন্য আগুনে ফুটাতে হয়। এটিই পানির প্রকৃত ধর্ম প্রাপ্ত করার প্রক্রিয়া। ধর্মহীন তথা বিষাক্ত, অপবিত্র পানি মানুষের জীবনের কারণ না হয়ে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

মানুষও একটি সাধারণ প্রাণী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে আস্তে আস্তে মনুষ্য ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে মানুষের স্তরে ওঠে। এই মনুষ্য ধর্ম হলো মানবতা। এক পিতার মধ্যে সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা থাকে তা পিতৃধর্ম, ছেলে-মেয়ের প্রতি মায়ের মমতা হলো মাতৃধর্ম, ভায়ের প্রতি ভায়ের যে প্রেম তা ভ্রাতৃধর্ম। আর মানুষের প্রতি মানুষের যে প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা সেটি হলো মনুষ্যধর্ম। যার মধ্যে অন্য মানুষের প্রতি যত বেশি ভালোবাসা সে তত বড় ধার্মিক। সন্তান কষ্টে থাকলে মা-বাবার মনেও সুখ থাকে না, সন্তানের কষ্ট দূর করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্ট করে। বাবা-মা হিসাবে এটা তাদের কর্তব্য। মানুষ কষ্টে থাকলে অপর মানুষও কষ্টে থাকবে, অপরের কষ্ট দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে- এটা মানুষ হিসাবে তার কর্তব্য, এটাই তার এবাদত। এই এবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা। সন্তানকে কষ্ট দিয়ে কি কখনো তার বাবা-মায়ের ভালোবাসা পাওয়া যায়? ঠিক একইভাবে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে কষ্টে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হলো- নামাজ, রোজা, পূজা, প্রার্থনা ইত্যাদি যে ধর্মীয় উপাসনাগুলি ধর্ম মনে করে, এবাদত মনে করে করা হয় সেগুলির উদ্দেশ্য কী? একটি লৌহকে যেমন চুম্বকের ধর্ম প্রাপ্ত করার জন্য নিরন্তর চুম্বক দিয়ে ঘর্ষণ করতে হয়, পানিকে যেমন বিশুদ্ধ করার জন্য ফুটাতে হয় ঠিক তেমনই মানুষের আত্মায় সর্বদা মনুষ্য ধর্ম তথা অন্য মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত রাখার জন্য নানা উপাসনা করতে হয়। মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্টই এমন যে, সে অসচেতনভাবেই নিজ স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হয়ে অপরের কল্যাণের চিন্তা ভুলেই যায়। নামাজ, রোজা, পূজা, প্রার্থনার মাধ্যমে সে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করবে, স্রষ্টাকে স্মরণ করবে, তার কর্তব্য তথা এবাদতের কথা স্মরণ করবে, সে নিজ স্বার্থ ভুলে জগৎসংসারের কল্যাণ চিন্তা করবে। অর্থাৎ উপাসনাগুলি হলো ধর্ম প্রাপ্ত করার প্রক্রিয়া। যতবেশি উপাসনা করবে তত বেশি ধর্ম প্রাপ্ত হবে। এই উপাসনাগুলি সকল খারাপ কাজ থেকে, অকল্যাণকর কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয় নামাজ সকল প্রকার ফাহেশা তথা অকল্যাণকর কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।” (সুরা আনকাবুত- ৪৫)। দিনরাত উপাসনায় মগ্ন থেকেও যদি কারো মধ্যে মনুষ্য ধর্ম জাগ্রহ না হয়, অকল্যাণকর কাজ থেকে সে বিরত না হয়, মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য নিজের জীবন-সম্পদ ব্যয় করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি না হয় তবে সকল উপসনায় ব্যর্থ।

হেযবুত তওহীদের এমাম প্রদত্ত ভাষণ

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে আদর্শিক লড়াইয়ের বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক:

গত ৮ জুন মেহেরপুরের জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি ও ধর্মবিশ্বাসের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

আমরা পথহারা ছিলাম, গোমরাহ ছিলাম। সত্য কী তা আমাদের জানা ছিল না। যে মহামানবের মাধ্যমে এই সত্যের সন্ধান পেলাম তিনি আমাদের এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। সারা বিশ্বে ইসলামের নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে হাজারো রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন তৈরি হয়েছে যেগুলোর কোনো কোনোটির বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে এমন কি প্রায় ১৫০ বছর পুরনো সংগঠনও আছে। সে তুলনায় হেযবুত তওহীদ আন্দোলন বেশি দিনের নয়। একটি আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা থাকে, প্রশাসনের মনেও অনেক প্রশ্ন থাকে। অনেকে বলে থাকেন, হেযবুত তওহীদ আবার নতুন করে কী বলছে, এরা নারী-পরুষ একসাথে মিটিং করে, একসাথে নামাজ পড়ে, ইসলামের কথা বলে আবার গানও গায়, মানবতার কথা বলে, ব্যাপারটা বুঝলাম না। আজ আমি চেষ্টা করব হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা দেওয়ার জন্য। তারপর তা স্বীকার করা না করা আপনাদের বিবেকের কাছে সমর্পিত হবে। আল্লাহ সকলের মনের খবর রাখেন, তিনিই তার হিসাব গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ আমাদেরকে অনর্থক, সময় কাটানোর জন্য সৃষ্টি করেননি:

আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা মানুষ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ বলেন, আমি এরাদা করেছি আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করব (সুরা বাকারা ৩০)। সুতরাং আমাদের পদবি হচ্ছে আল্লাহর খলিফা। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাই আমার এবাদত। তিনি বলেছেন জ্বীন ও ইনসানকে তাঁর এবাদত করা ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি করেন নি (সুরা যারিয়াত ৫৬)। তাহলে এই পৃথিবীতে আমাদের এই সুন্দরতম অবয়ব নিয়ে

আগমনের উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ গরু-ছাগল-বৃক্ষরাজী, মৎস্যকুল, আসমান জমিন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন কুন শব্দ দ্বারা, পক্ষান্তরে মানুষ সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে। আল্লাহ তাঁর নিজের রূহ মানুষের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। সুতরাং সর্ববিচারে মানুষ এক অনন্য অসাধারণ সৃষ্টি। আল্লাহর পবিত্র রূহ ধারণ করে মানুষ যদি পশুর মতো জীবন যাপন করে, খায়, বংশবিস্তার করে, মরে যায় তবে তার মানবজীবনই ব্যর্থ। মানুষ অন্য সৃষ্টির মতো নয়। তার দেহ আছে, আত্মাও আছে; ইহকাল আছে, পরকালও আছে। পশুর পরকাল নেই। কাজেই মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ হতে হবে দুই জীবনকে সামনে রেখে। আল্লাহ বলেছেন, আমি অনর্থক, খেলাচ্ছলে, সময় কাটানোর জন্য কিছু সৃষ্টি করি নি। আমাদের চারপাশে, এই সৃষ্টিজগতে এমন কিছু কি আছে যা আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেছেন? নেই। তাহলে আমি মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আমাকে কি তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেছেন? না। আমাদের জীবনও তাই অর্থপূর্ণ হতে হবে। আমরা সালাতের পরে দোয়া করি, 'হে আমাদের রব। আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করো এবং আমাদের আখেরাতের জীবনকেও সুন্দর ও মঙ্গলময় করো।' যার দুনিয়ার জীবন সুন্দর নয়, তার পরকালও সুন্দর হবে না। দুই জীবনকে আলাদা করার সুযোগ নাই ঠিক যেভাবে দেহ আত্মা আলাদা করার সুযোগ নেই।

মাননীয় এমামুয্যামান কে ছিলেন:

মাননীয় এমামুয্যামান এ উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান। সুলতানী আমল, মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরযুগ- এই সুদীর্ঘ সময়ে এ পরিবারের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। এমামুয্যামানের পূর্ব পুরুষ সুলতান দাউদ খান কররানি ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তথা বৃহত্তর গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান। তিনি এদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজমহলের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। আরেক মহান ব্যক্তি দানবীর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পেছনে নিজের জমিদারি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, জেলও খেটেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন এমামুয্যামানের মায়ের নানা, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহও ছিলেন তাঁদের নিকটাত্মীয়। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বোগরা ছিলেন এমামুয্যামানের খালু। এভাবে বলতে গেলে অনেক। এক কথায় এদেশের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিতে পন্নী পরিবারের বিরাট অবদান রয়েছে। কিন্তু সেই ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে। জানলে এমামুয্যামানের বিরুদ্ধে কোনো অপপ্রচার জায়গা পাবে না।

এমামুয্যামান কী বলেছেন:

তিনি বলেছেন, এই যে আমরা বিশ্বের বর্তমানে ৭০০ কোটি মানুষ। এই বিশ্বের অবস্থা কী? গোটা বিশ্ব আজ অন্যায় অশান্তিতে ভরপুর। এ থেকে মানুষকে রক্ষার চেষ্টা কম হচ্ছে না। তথাপি দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ১৪ কোটি মানুষ নিহত হলো, আহত-পঙ্গু, উদ্বাস্তুর কোনো হিসাব নেই। তারপর থেকে আরো পাঁচ কোটি মানুষ বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আর সামাজিক অন্যায়-অশান্তি এমন প্রকট আকার নিয়েছে যা অতীতে কখনো হয় নি। বাল্যবয়সেই এমামুয্যামান এর কারণ ভাবতে লাগলেন। আল্লাহ তাঁকে ধীরে ধীরে সেই প্রশ্নের জবাব দান করলেন। এখানে একটি কথা বলতে হয়, আমরা যখন বলি আল্লাহ সেই জ্ঞান এমামুয্যামানকে দান করলেন, তখন প্রশ্ন তোলা হয় - 'কী? উনাকে দান করলেন? উনি কি নবী-রসুল নাকি?' অথচ আমি যদি বলি আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন, তাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন কিন্তু কেউ আপত্তি করে না। তাহলে জ্ঞান কে দান করেন? অবশ্যই আল্লাহ। এমামুয্যামান বললেন, বিশ্বে ১৬০ কোটি মুসলিম, লক্ষ-লক্ষ মসজিদ, আলেম-ওলামা, কামেল, পীর কিছুরই কমতি নেই। পৃথিবীর ৫৫ টি রাষ্ট্রে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের হাতে। বড় বড় সমুদ্র বন্দর তাদের অধীন। তবু কেন তাদের বিশ্বজোড়া এই অশান্তি, এই দুর্গতি। আল্লাহ কি এ জাতিকে বলেন নি তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি? তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার জন্য? এই কী জাতির শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা? তোমরা অন্যকে কী শান্তি দেবে, তোমরা নিজেরাই আছ ঘোর অশান্তির মধ্যে। এর কারণ তোমরা ইসলামের ভিত্তি তওহীদ অর্থাৎ কলেমা - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

থেকেই সরে গেছ। এখন তোমাদের নামাজ রোযাসহ সব আমল অর্থহীন হয়ে গেছে।

বর্তমানের প্রচলিত ইসলাম রসুলাল্লাহর ইসলাম নয়: আজকের এই ১৬০ কোটি মুসলিম দাবিদার আর আল্লাহর রসুলের সৃষ্টি করে যাওয়া উম্মতে মোহাম্মদী কি এক জাতি? না। আল্লাহর রসুল রেখে গেলেন একটি মহাজাতি যারা শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, সামরিক শক্তিতে সর্বদিকে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছিল। এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, একজন নারী মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতে পারত। সম্পদের এমন প্রাচুর্য এসেছিল যে উটের পিঠে খাদ্য ও অর্থ বোঝাই করে মানুষ পথে পথে ঘুরত, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যেত না। আল্লাহর রসুল চলে যাওয়ার ৬০/৭০ বছর পরে জাতি সংগ্রাম ত্যাগ করল, প্রকৃত ইসলাম ত্যাগ করল। পরিণামে আল্লাহর শাস্তি এ জাতির জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ এক সময় জাতিকে কঠিন শাস্তি দিয়ে ইউরোপের জাতিগুলোর গোলামে পরিণত করে দিলেন। আমরাও ৩০০ বছর আগে ব্রিটিশদের পদানত হয়ে গেলাম। তারা শাসনক্ষমতা পেয়েই এক শয়তানি বুদ্ধি আঁটল। তারা চাইল শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতিটিকে একটি গোলাম মানসিকতাসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করতে। তারা দু'টি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করল। মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কী পড়ানো হবে তার সিলেবাস খ্রিষ্টান পণ্ডিতরাই নির্ধারণ করলেন। ২৬ জন খ্রিষ্টান প্রিন্সিপাল ১৪৬ বছর ধরে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় এ জাতিকে ইসলাম শিক্ষা দিল। সেখানে কিন্তু মানবতা, ঐক্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েলের বিশ্লেষণ, বাহাস-তর্কাতর্কি, যেন এই মুসলিম জনসংখ্যাটি কোনোভাবেই আর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। আজও একটি কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, দুইজন আলেম এক সাথে থাকতে পারে না। এটা কোন ইসলাম? ব্রিটিশদের তৈরি ইসলাম শিখে অহংকারে তাদের মাটিতে পা পড়ে না, যেন ইসলামের ঠিকাদারি তারা নিয়ে নিয়েছেন। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো সাধারণ মানুষকে জীবন-জীবিকার বাইরে কিছুই জানতে দেওয়া হয় না। তারা জানেন না ইসলামের ইতিহাস, জানেন না নিজেদের ইতিহাস। জানবে কী করে? তাদেরকে তো কেবল একটি ভোটদানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর ধর্ম-ব্যবসায়ীরা বলছেন যে, তোমার বাচ্চা হয়েছে- আমাকে ডাকো মিলাদ, আকিকায়, মোসলমানিতে দোয়া করে দেব, বাবা মারা গেছে- আমাকে ডাকো কোর'আন খানি, জানাজা পড়ে দেব, বিয়ে করতে চাও- বিয়ে পড়িয়ে দেব। সবই টাকার বিনিময়ে, সওয়াবের বিনিময়ে নয়। কিন্তু আমাদের রসুলের জাতি এমন ছিল না। তাদের অধিকাংশই ১০০০ পর্যন্ত গুণতেও পারতো না, কিন্তু বিশ্বের বুকে তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতি। সেই ইসলাম আজকে কোথায়? আমাদের ১৬ কোটি বাঙালির ধর্মবিশ্বাসকে বার বার এই ধর্মব্যবসায়ীরা হাইজ্যাক করে জাতির অকল্যাণে ব্যবহার করেছে। এখন আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে গেছে। এই জমিন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এখানে কাউকে অশান্তি সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। এখানে থাকবে শুধু শান্তি।

সমাজ পরিবর্তনে চাই আদর্শিক লড়াই: আমাদেরকে অনেকে বলেন, আপনারা সরকারের সঙ্গে কাজ করেন কেন? তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, প্রশ্নের আগে চিন্তা করতে হয় যে প্রশ্নটি জাতির কল্যাণের জন্য না অকল্যাণের জন্য করা হচ্ছে। সরকার একটি জাতির মস্তকের মতো। একটি জাতিকে যখন সকল অন্যায়, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েছে তখন সেটা কি কোনো ব্যক্তি বা আন্দোলনের কাজ, নাকি জাতির কাজ? সেটা অবশ্যই জাতীয় কাজ অর্থাৎ সরকারের কাজ। এখানে আমাদের কোনো ব্যক্তিস্বার্থ থাকলে অন্য কথা ছিল। আমরা সরকারকে বলেছি, যে যা-ই বলুক, বাস্তবতা হচ্ছে আপনারা এখন ক্ষমতায়। আপনাদের কাছে আছে শক্তি, অস্ত্র, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, অর্থ, আইন। যে অপরাধের শাস্তি ছিল চার বছর, সেটা এখন চৌদ্দ বছর। অনেকে বলেন আইন দুর্বল, কিন্তু আমি মনে করি, আইন যথেষ্ট শক্তিশালী আছে। এখন অন্যদিকে চিন্তা করা দরকার। সেটা হচ্ছে শুধু আইন, শক্তি, অর্থ দিয়ে হবে না। লাগবে একটি নির্ভুল আদর্শ যেটা দিয়ে মানুষের আত্মার

পরিবর্তন, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বর্তমানে নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সমাজ-বিশেষজ্ঞ মিডিয়া সবাই বলছেন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, গণসচেতনতা। কিছুদিন আগে আইজিপি সাহেব বললেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কয়েকটা মেয়ের শ্লীলতাহানী করা হলো, মানুষ কেন অপরাধীদেরকে পাকড়াও করল না। অপরাধীকে গ্রেফতার করার অধিকার সব নাগরিকের আছে।' আমাদের কথা এখানেই। জনগণ যে প্রতিরোধ করবে, কেন করবে সেটা জনগণ জানে না, সেটা তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। এই শিক্ষা কোথায় আছে? মাদ্রাসাতেও নেই, স্কুল-কলেজেও নেই। সেটা আমাদের কাছে আছে। মানুষ ধর্মবিশ্বাসী, তাই তাদেরকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা দিতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব। তাকে সামাজিক দায়িত্ব কী শেখাতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তার আসল এবাদত কী, তার প্রকৃত ধর্ম কি, সামাজিক দায়বদ্ধতা কী? মানুষকে যদি ধর্ম ও দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবে তারা অপরাধ হতে দেখলে অবশ্যই প্রতিহত করবে, সেজন্য জীবনও দিয়ে দেবে। শুধু শক্তি দিয়ে এটা করা সম্ভব নয়। আগেই বলেছি দেহ ও আত্মা দুটির সমন্বয়ে মানুষ। শক্তি দিয়ে আত্মার পরিবর্তন হয় না, সেখানে আদর্শ লাগে। আমরা সাংসদবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রশাসন সবার সামনে বিষয়টি উত্থাপন করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, তারা অনেকেই বুঝেছেন, ইনশা'আল্লাহ অন্যরাও বুঝবেন।

> শুধু আইন, শক্তি, অর্থ দিয়ে অপরাধ নির্মূল সম্ভব নয়। এর জন্য লাগবে একটি নির্ভুল আদর্শ যেটা দিয়ে মানুষের আত্মার পরিবর্তন, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বর্তমানে নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সমাজ-বিশেষজ্ঞ মিডিয়া সবাই বলছেন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, গণসচেতনতা লাগবে। এই শিক্ষা কোথায় আছে? আমরা মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করতে চাই।

জঙ্গিবাদ কারা সৃষ্টি করেছে:

আমি এ বিষয়ে একটি বই লিখেছি নাম 'ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের যোগফল জঙ্গিবাদ: উত্তরণের একমাত্র পথ'। এতে আমি নিজে থেকে কোনো কথা বলি নি, দলিল যা পেয়েছি সে আলোকেই প্রমাণ করেছি যে, জঙ্গিবাদ ইসলামের সৃষ্টি নয়, এটি একটি সুবৃহৎ পশ্চিমা ষড়যন্ত্র। এই পৃথিবীকে তারা জাহান্নামের কুণ্ডলি বানিয়ে রেখেছে। কম্যুনিজমের পতনের পর তারা প্রতিপক্ষ হিসাবে ইসলামকে টার্গেট করেছে। আমাদের আলেমরা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে এ জাতির তরুণদেরকে জঙ্গিবাদের দিকেই উসকে দিচ্ছেন। পশ্চিমারা পুঁজিবাদী পরাশক্তিগুলো বুঝতে পেরেছে যে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতনের পর তাদের সামনে থ্রেট ইসলাম যার বিরাট একটি আদর্শ আছে, অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ আছে, নবীর প্রতি প্রেম আছে, আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আছে, অতীত ইতিহাস আছে। সুতরাং তাদের উত্থান রুখে দিতে হবে। এভাবে তারা জঙ্গি ইস্যু সৃষ্টি করে একের পর এক দেশ ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, ইয়ামেন দখল করে নিয়েছে। এভাবে চলবে একটার পর একটা। বাংলাদেশও এর সঙ্গে কিভাবে সংযুক্ত তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমাদের তো দেশ দুনিয়ার কোনো খবর নেই, খেতে কাজ করব, চাকরি-বাকরি করব, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ব আর জান্নাতে চলে যাব । কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। পাঁচটি বিষয় নিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমার ব্যক্তিজীবন, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার দেশ, আমার পৃথিবী। স্বার্থপরের মতো আমরা বসে থাকতে পারি না। কারণ স্বার্থপরের কোনো সমাজ নেই, স্বার্থপরের নামাজ নেই, স্বার্থপরের জান্নাত নেই। আমরা কেন এমন স্বার্থপর হলাম? এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বানিয়েছে। তাই আমাদের সামনে অপরাধ হলে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু ১৬ কোটি মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া আদৌ পুলিশের পক্ষে সম্ভব কি না? নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন, কখনোই সম্ভব

নয়। মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়বদ্ধতাই সমাজের নিরাপত্তার প্রথম শর্ত। সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের সামাজিক কর্তব্য কী? আমাদের প্রকৃত ধর্ম কী?

প্রকৃত মো'মেনদের জন্যই সকল আমল, এই মো'মেন কারাঃ

পবিত্র কোর'আনে ইসলামকে বলা হয়েছে দীনুল হক বা সত্য জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ যে সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। যে সময়ে হবে সেই যুগটিই হচ্ছে সত্যযুগ। ধর্ম হলো কোনো বস্তুর অভ্যন্তরের শক্তি যা সে ধারণ করে নিজের বৈশিষ্ট্যে অটল থাকে। চুম্বক যদি আকর্ষণ শক্তি হারায় তাহলে সেটি আর চুম্বক থাকে না। তাহলে মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতা। অন্যের দুঃখ দেখে সে হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করবে এবং তার কষ্ট দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করবে। জেহাদ শব্দের অর্থই আপ্রাণ প্রচেষ্টা। রাতের অন্ধকারে বাসের মধ্যে বোমা মারা জেহাদ নয়। জেহাদ থাকতেই হবে, কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ না থাকলে সেই সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়। আমরা বলি, নামাজ রোযা সব মো'মেনের জন্য। আল্লাহ বলেছেন, মানুষ দুই প্রকার, হয় কাফের নয় মো'মেন (সুরা তাগাবুন ২)। এই নামাজ কার জন্য? মো'মেনের জন্য। আল্লাহ গোনাহ ক্ষমা করবেন কার? মো'মেনের। মো'মেন কে? আল্লাহ বলছেন, মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর তা থেকে বিচ্যুত হয় না এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করে (হুজরাত ১৫)। আল্লাহ রসুলের প্রতি ঈমান মানেই সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম মানেই মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করা। এই সমস্ত কিছুর ফলাফল শান্তি। আমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হতে চাই, তবে লেবাসধারী ধার্মিক নয়। আমরা লেবাসের বিরুদ্ধে না, আল্লাহর রসুলের প্রতিটি বিষয় কল্যাণকর, যে তা অনুকরণ করবে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু মূল কাজ বাদ দিয়ে লেবাস ধরে থাকলে কোনো লাভ হবে না। মানুষকে যদি তার প্রকৃত এবাদত কী তা বোঝানো হয় তাহলে পুলিশ দিয়ে মানুষকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে না। একটি উদাহরণ দিইঃ ধরুন আপনি তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করলেন। হঠাৎ পাশে থেকেই আগুন আগুন চিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? নিশ্চয়ই ছুটে যাবেন আগুন নেভাতে। যদি যান তাহলেই আপনি প্রকৃত এবাদত করলেন। নিশ্চয়ই তখন জিজ্ঞেস করবেন না যে, যার বাড়িতে আগুন লেগেছে সে হিন্দু না খ্রিষ্টান না মুসলমান? আমাদের রসুল ও সাহাবীরা এই লক্ষ্যেই সংগ্রাম করেছেন। তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়েন নাই। কিন্তু প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর পরে উমাইয়া, ফাতেমি, আব্বাসীয়, মোগল, পাঠান জাতিগুলো যারা সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ করেছে, সেটাকে আমরা ইসলাম বলি না। প্রকৃত ইসলাম মহনবীর ইন্তেকালের ১০০ বছরের মধ্যেই হারিয়ে গেছে।

ঐক্যের গুরুত্বঃ

আমাদের কথা হচ্ছে, ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে এই ভূখণ্ড স্বাধীন করেছিল। তারপর থেকে গত ৪৪ বছরে একটি মুহূর্তের জন্যও জাতিটিকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেয় নাই পশ্চিমা ষড়যন্ত্র আর ধর্ম ও পশ্চিমা মতবাদ ভিত্তিক অপরাজনীতি। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, ঐক্য সর্বদা অনৈক্যের উপর বিজয়ী হয়। একশ' জন ঐক্যহীন লোক ১০ জন ঐক্যবদ্ধ লোকের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়। আমরা এ সত্যটিই মানুষের কাছে তুলে ধরছি। একজন মানুষ হিসাবে, আল্লাহয় বিশ্বাসী হিসাবে সমাজের প্রতি আমার কী কর্তব্য রয়েছে, তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা কোনোদিনও আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না। আমরা মনে করি এটা আমাদের এবাদত। মানুষের দুঃখ দূর করা আমার মুখ্য কর্তব্য। জাতির ঘোর সংকটে আমি যদি স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে থাকি, তাহলে আমার দুনিয়াও শেষ, পরকালও শেষ। এটাই আমার ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা, মানবজন্মের ব্যর্থতা।

এই দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছেঃ

এই দেশে আমি বড় হয়েছি, এখানে আমি সেজদা করি, এখানের উৎপন্ন ফল ও ফসলে আমি পুষ্ট হয়েছি। সুতরাং এই দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। আমার এই দেশটি কোনোভাবে যদি সিরিয়া, ইয়ামেন হয়ে যায় তাহলে মসজিদ মাদ্রাসা কিছু থাকবে না। দুটি ভাবে দেশ ধ্বংস হতে পারে,

অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ। আমাদের এখানে দুটোর সম্ভবনাই প্রবল। এদেশের ৯০% মানুষ মুসলমান। গুটিকয়েক ধর্মব্যবসায়ীর কারণে পাহাড়ের মতো বিশাল, আকাশের মতো উদার ইসলামকে আজ গালাগালি করা হচ্ছে। আমাদের ধর্মবিশ্বাস, আমাদের মুসলিম পরিচয় আমাদের জন্য কাল হয়ে গেছে। অথচ আমাদের এই ধর্মবিশ্বাস আমাদের শক্তি। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা একটি ইস্পাতকঠিন জাতি গঠন করতে পারি। ষোল কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে পৃথিবীর কোনো পরাশক্তি থাকবে না আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়। আমাদের সম্পদ আছে, উর্বর মাটি আছে। আমাদের কারো কাছে মাথা নত করতে হবে না। এর জন্য মাত্র একটি কথা আমাদের মানতে হবে, আমরা আর রাজনৈতিক হানাহানি করব না। আর আলেম সাহেবদের প্রতি কথা হচ্ছে, আপনাদের অগাধ জ্ঞান, আমাদের তা নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, যে আলেমের জ্ঞান মানবতার কল্যাণে কাজে লাগে না, সেই আলেমকে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই, যে বিত্তবানের সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হয় না, সে বিত্তবানকে আল্লাহরও কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা নির্দোষ সাধারণ মানুষগুলোকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার জন্য ধর্মবিশ্বাস দিয়ে উদ্বুদ্ধ করুন, যেন তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। তাহলেই তারা প্রকৃত মানুষ হবে। আল্লাহ বলেছেন, মতভেদ করো না। আজ মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া সুন্নীর লড়াইয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হচ্ছে। দুই পক্ষই মসজিদে যাচ্ছে, দু পক্ষেরই দাড়ি আছে। তাদের কে জান্নাতে যাবে? আমাদের কথা হচ্ছে, মানবতা যখন বিপন্ন তখন যারা ব্যক্তিগত আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের সেই আমল গৃহীত হবে না, তখন তাদের রোযা রাখা হবে উপবাস আর তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা।

রাজনীতি করতে হবে মানবতার কল্যাণে:

আপনাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সুতরাং নিজের ঘরে খাবেন, নিজের টাকায় গাড়ির তেল কিনে ব্যবহার করবেন, নিজের পকেট থেকে ফোন বিল দিবেন। জনগণের সম্পদ লুট করে খাওয়ার রাজনীতি এ জাতিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, এ সিস্টেমকে ধরে রেখে কোনোদিনও শান্তি আসবে না। এটাই অপরাজনীতি, দেশপ্রেমের ব্যবসা, জনসেবার ব্যবসা। এই রাজনীতি মানুষকে মানুষ না বানিয়ে কোটি কোটি ভোটারে পরিণত করেছে।

আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার চালানো হয়েছে:

এমামুয্যামানের বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার চালানো হয়েছে যে পন্নী সাহেব খ্রিষ্টান হয়ে গেছেন ইত্যাদি। একটি জাতির ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার আহ্বান করার অর্থ কি খ্রিষ্টান হওয়া? বিশ্বজুড়ে যখন জঙ্গিবাদের সূচনা হলো তখন হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধেও এক শ্রেণির ইসলামবিদ্বেষী গণমাধ্যম অপপ্রচার শুরু করল যে আরবি নাম হেযবুত তওহীদ, সুতরাং এটা একটি জঙ্গি সংগঠন। এখন অবশ্য আর এসব অপপ্রচার করে লাভ হবে না, মানুষ সত্য জানতে পারছে।

শেষ আবেদন:

আপনারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন। আসুন আমরা একে অপরের সহযোগিতা করি, অন্যের সমালোচনা কম করি, নিজের ভুলত্রুটিগুলো একটু দেখি। সরকার চাচ্ছে দেশে শান্তিরক্ষা করতে, কিন্তু একটি আদর্শ লাগবে। সেটা মাদ্রাসায় নেই, ফলেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন আমরা নিঃস্বার্থভাবে ভূমিকা রাখতে চাই। আমাদের ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, সেটা আমাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করুন। আমরা সংশোধিত হতে প্রস্তুত। আমরা মনে করি, রসুলাল্লাহর সংস্পর্শে আইয়ামে জাহেলিয়াতের খারাপ মানুষগুলোও সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল, এখনও একটি সঠিক আদর্শ পেলে ঐক্যহীন, দাঙ্গাবাজ, সন্ত্রাস, দুশ্চরিত্র মানুষগুলোও সোনার মানুষে পরিণত হবে। ইদানীং দেখছি, কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। এটা ভুল পথ। এ সহিংসতার পথ পরিহার করুন। ইসলামকে বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে, যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করুন, সমালোচকদের যুক্তির জবাব দিন। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করুন, তাহলেই অপপ্রচারকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রার্থনা:

হে আল্লাহ! আমাদের ঈমানকে হেফাজত করো। আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি যেন আক্রান্ত না হয়, আমাদের দেশের মানুষ যেন সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে সে লক্ষ্যে আমাদেরকে জীবন-সম্পদ কোরবান করে সংগ্রাম করার তওফিক দান করো। আমীন।

হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমামের ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে
লিংক: https://www.facebook.com/hussainmsalim?fref=nf

'অল্পে তুষ্টি' অর্থ স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা বরণ নয়

অল্পে তুষ্ট থাকা মো'মেনের অনন্য বৈশিষ্ট্য- এটা ঠিক, কিন্তু আজকাল এই 'অল্পে তুষ্টি'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তা ঠিক নয়। বর্তমানে রসুলের হাদিস থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়, যেখানে রসুলাল্লাহ বলেছেন, অঢেল সম্পদ থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না, বরং মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঈশ্বর্য (বোখারী, মুসলিম)। এছাড়াও রসুলাল্লাহ ও তাঁর আসহাবগণের জীবনী থেকে বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা ঘটিয়ে অনেকে দেখাতে চান যে, তাঁরা খুব অনাড়ম্বর, সাধাসিধে, প্রকারান্তরে দরিদ্র জীবনযাপন করেছেন, ছেঁড়া পোশাক পরেছেন, অনেক সময় প্রায় অভুক্ত থেকেছেন। কাজেই আমাদেরও অল্পে তুষ্ট থেকে ঐরূপ জীবনযাপন করা উচিত। এই চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে অনেক ধর্মভীরু মানুষ বেশি অর্থোপার্জন করাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তারা শুধু জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু রোজগার করাকেই যথোচিত জ্ঞান করে তার বেশি পরিশ্রম করা বা আর্থিকভাবে আরও স্বচ্ছল হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা বরণ করে নেন। বেশি ধন-সম্পদের মালিক হলে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে, আল্লাহর কাছে সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে, হাশরের ময়দানে তিল পরিমাণ সম্পদের সঠিক হিসাব প্রদান না করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না- আলেম মাওলানাদের এমন সাবধানবাণী স্মরণ করে তারা দরিদ্র জীবনকেই কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন আর ভাবেন, পৃথিবীর জীবন যেহেতু পরকালের তুলনায় কিছুই না, কাজেই অল্পে তুষ্ট থেকে কোনো রকমে আলুসিদ্ধ ডাল খেয়ে জীবনটা পার করে যেতে পারলেই হলো।

এখানে আমার ভিন্নমত রয়েছে। অল্পে তুষ্টি অর্থ স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা বরণ করা নয়। ইচ্ছা করে দরিদ্রতা অবলম্বন করাই বরং গুনাহ্‌র কাজ। কারণ, তার এই কাজে না সে নিজে লাভবান হয়, না মানবজাতি লাভবান হয়। অল্পে তুষ্টির অর্থ ভিন্ন। একটি উদাহরণ। ধরুন আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী অনেক আয় রোজগার করলেন, যা আপনার প্রাথমিক প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। এই রোজগার থেকে আপনি একশ'টি শার্ট কিনলেন। তার মধ্যে নিজের জন্য বিশটি শার্ট রেখে বাকি আশিটি শার্ট আপনি সমাজের গরীব-দুঃখী, ছিন্নমূল মানুষকে দান করে দিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু সবগুলো শার্টই নিজের ও পরিবারের জন্য রাখতে পারতেন, বিষয়টি আপনার ইচ্ছাসাপেক্ষ, বৈধভাবে উপার্জিত টাকায় আপনি একশ' কেন হাজারটা শার্টও ক্রয় করতে ও ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আপনি শুধু নিজের কথা চিন্তা না করে সমাজের কথাও ভাবলেন এবং আপনার উপার্জিত সম্পদ থেকে আপনার পাশাপাশি সমাজের আশিটি দুস্থ পরিবার উপকৃত হলো। কিন্তু শুধু ন্যূনতম খাওয়া-পরার চিন্তা করে সামান্য কিছু উপার্জন করেই ক্ষান্ত থাকলে, নিজের ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ বিশটি শার্ট হয়তো আপনি ক্রয় করতে পারতেন কিন্তু তার দ্বারা সমাজ কখনই উপকৃত হতো না।

একইভাবে ধরুন আপনার দশ লক্ষ টাকা আছে। ইচ্ছা করলেই আপনি একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করতে পারেন। কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন ভিন্ন। ভাবলেন- পৃথিবীতে একটি ছোট ঘর হলেই হবে, এখানে এর বেশি কিছু দরকার নাই, যা নেবার আমি পরকালে আল্লাহর কাছে নেবো। এই ভেবে আপনি যদি এক লক্ষ টাকার ছোট একটি ঘর তৈরি করে বাকি নয় লক্ষ টাকা আর্তপীড়িত গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে ব্যয় করেন তাহলে আপনি অল্পে তুষ্ট থাকলেন। এটাকে বলে অল্পে তুষ্টি। কিন্তু আপনি চেষ্টা

করলেন না, পরিশ্রম করলেন না, আল্লাহর দেওয়া সামর্থ্যকে কাজে লাগালেন না, উপায়-উপার্জন করলেন না, ইচ্ছা করে কুঁড়ে ঘরে থাকলেন, ছেঁড়া ছ্যান্ডেল পরলেন, পান্তা ভাত খেলেন, আর বললেন আমি অল্পে তুষ্ট সেটা মানা যায় না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অল্পে তুষ্টির অজুহাতে সে সামর্থ্যকে ব্যবহার না করাটাই বড় অন্যায়। স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা বরণ না করা, পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করা এবং প্রতিবেশিকে সেই অর্থ থেকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে রসুলাল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন- "আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, দুনিয়ায় যত নবী-রসুল এসেছেন তাদের সবাই রেযেক হাসিলের জন্য চেষ্টা- সাধনা করতেন এবং নিজেদের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। অতএব তোমরাও রুযি হাসিলের জন্য কোশেশ করো। মেহনত-মজদুরী করা এবং লাকড়ির বোঝা নিজের মাথায় উঠানো অন্যের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম। যার জীবিকা উপার্জনের সামর্থ্য রয়েছে অন্যের কাছে চাওয়া তার জন্য খুবই অসম্মানজনক। সে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত এবং শেষ বিচারের দিনও তাকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে তার চেহারায় গোশত থাকবেনা। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের বলছি, যার কাছে একদিনের খাদ্যও মওজুদ রয়েছে তার জন্য সওয়াল করা (হাত পাতা) অবশ্যই হারাম। আমি জানি, কোনো কোনো সংসারত্যাগী ভিক্ষাবৃত্তিকে জায়েয বলে, কিন্তু ইসলাম হাত-পা গুটিয়ে বসা এবং ভিক্ষাবৃত্তি এখতিয়ার করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম আমাদের হুকুম করেছে যে, দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাও এবং আল্লাহর করুণা তালাশ করো। যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচবে, নিজের পরিবার-পরিজনের পর-ওয়ারিশ করা ও প্রতিবেশীর সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য হালাল উপায়ে জীবিকা হাসিল করবে সে কেয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল চেহারা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। দুনিয়াতেও তার জন্য সম্মান ও প্রতিপত্তি রয়েছে। [মহানবীর ভাষণ, সিরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা]

আমাদের বুঝতে হবে রসুলাল্লাহ ও তাঁর অধিকাংশ আসহাবগণ কেন দরিদ্র জীবনযাপন করেছেন? কারণ তাঁরা সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, অশ্লীলতা এক কথায় সকল প্রকার মিথ্যা দূর করে সত্য, ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রামরত ছিলেন। সেই সংগ্রামে তাঁরা এতটাই ব্যস্ত থেকেছেন যে আয়-উপার্জনের জন্য তাদের সুযোগ ছিল অত্যন্ত কম। এর মধ্যেও যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তা কজে লাগিয়ে তাঁরা উপার্জন করেছেন, উপার্জিত সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। যদি তাদের অনুসরণে দরিদ্রতা অবলম্বন করতে চান তবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তথা মানুষের কল্যাণে জীবন ব্যয় করুন। কিন্তু মানুষের কল্যাণের কোনো কাজ করলেন না আবার উপার্জনও করলেন না, স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা অবলম্বন করে তুষ্ট থাকলেন এটা কখনোই রসুলাল্লাহর অনুসরণ হবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত ঘটনা। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর শাসনকালে একবার মদীনা মুনাওয়ারায় অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। উচিত মূল্য দিয়েও খাদ্য সংগ্রহ দুস্প্রাপ্য হয়ে গেল। মানুষের মধ্যে হতাশা, হাহাকার। তৎকালীন সময়ে উসমান (রা.) ছিলেন মদীনার সবচেয়ে বড় আমদানিকারক। একদিন সিরিয়া থেকে তাঁর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের বহর মদীনায় এসে পৌঁছল।

বিপুল চাহিদার কারণে সেখানকার ব্যবসায়ীরা সমস্ত পণ্য গুদামজাত করার পূর্বেই কিনে নিতে চাইল চড়া দামে। দাম বাড়াতে বাড়াতে প্রতি দশ টাকার মাল ১৫ টাকা লাভ দিতে চাইল। কিন্তু উসমান (রা.) কোনো পণ্য বিক্রি না করে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে এই বলে খবর পাঠালেন যে, সিরিয়া থেকে আজ আমদানি করা সমস্ত খাদ্যশস্য আমি মদীনার অভাবগ্রস্থ লোকদের মাঝে দান করে দিলাম। এরপর ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বললেন, দেখলেতো আমার এ সমস্ত পণ্য ১০ গুণ লাভে আল্লাহর কাছে বিক্রি করলাম।

তিনি কিন্তু উপার্জনের চেষ্টা ছেড়ে ঘরে বসে থাকেন নি বরং উপার্জনের জন্য চেষ্টা করেছেন, তৎতকালীন সময়ের অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়েছেন কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেছেন, কোনো ভোগ-বিলাস, অপচয় করেন নি।

সুতরাং আমি অল্পে তুষ্ট এ কথা তখনই বলা যাবে যখন আমি সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালাব এবং আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে উপার্জন করার পর নিজের জন্য নিতান্তই প্রয়োজনীয় ব্যয় করব আর বাকি সবটুকু অন্য মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দেব। এটাই হলো মো'মেনের অল্পে তুষ্টি। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টা না করে ইচ্ছা করে দরিদ্র হলাম, যা দ্বারা আমি ও আমার সমাজ কেউই উপকৃত হলো না, এটা অল্পে তুষ্টি নয়।

ড. ইউনুস কর্তৃক বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্জনের প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে আমাদের কথা

দারিদ্র্যের হাহাকার থেকে মুক্তির পথ আল্লাহ দান করেছেন

মো. রিয়াদুল হাসান

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস গত ২ জুন সোমবার রাজধানীর পুলিশ স্টাফ কলেজের কনভেনশন হলে সামাজিক ব্যবসা একাডেমিয়া ২০১৫ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যে কথাগুলো বলেছেন তা সমাজের প্রতিটি মানুষের চিন্তায় সাড়া জাগানোর মতো। অত্যন্ত সরল ভাষায় তিনি বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলো তুলে ধরে একে বর্জন করার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "বর্তমান বিশ্বে 'ব্যক্তির লাভবান হওয়ার' ধারণাকেন্দ্রিক যে অর্থনৈতিক কাঠামো চালু রয়েছে তাতে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এই অর্থনৈতিক কাঠামো আর চলতে পারে না। কারণ এ ব্যবস্থা টেকসই নয়। এ ছাড়া বর্তমান জীবনব্যবস্থার সাথেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই অচলায়তন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

নিঃসন্দেহে খুবই বড় কথা। কারণ মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিরাপত্তা এবং তারপরেই অর্থনীতি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতার ফলস্বরূপ বিকশিত মার্কসীয় অর্থনীতিও ব্যর্থ হয়েছে নিদারুণভাবে। তাই নতুন বোতলে আবার ফিরে এসেছে পুরাতন পুঁজিবাদ। সেটাও এখন ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতেও ৯৯% ভাগ মানুষকে বঞ্চিত করে ১% মানুষ বিরাট সম্পদের পাহাড়ে বসে আছে। ট্যাক্স নেওয়ার সময় কিন্তু ঐ বঞ্চিত ৯৯% এর কাছ থেকেও নেওয়া হচ্ছে। দানের পরিবর্তে জোর করে ট্যাক্স আদায়ের এই সিস্টেম কতটুকু মানবকি তা ভাববার আছে। পাশাপাশি ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব ইত্যাদি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ থেকে বাঁচার জন্য বিশ্বের পরাশক্তিগুলো এখন তাই যুদ্ধ অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে এবং বিভিন্ন দেশে যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করে সেখানে অস্ত্র ব্যবসা করে নিজেদের অর্থনীতিকে বাঁচাতে চাইছে।

কোনো মতামত যুক্তিসিদ্ধ কিনা তা যাচাই করার জন্য যুক্তিবিদ্যায় অভিজ্ঞতার ব্যবহার করা হয়। ১৪০০ বছর আগে প্রকৃত ইসলামের অর্থনীতি কী ফল বয়ে এনেছিল সেই অভিজ্ঞতাটি উল্লেখ করতে পারি। যে এলাকাগুলোয় সেই অর্থনীতিক সিস্টেম প্রযুক্ত হয়েছিল সে এলাকাগুলোতে মানুষ এমন স্বচ্ছল হয়ে গিয়েছিল যে, উটের পিঠে খাদ্য ও অর্থ বোঝাই করে মানুষ শহরের পথে পথে, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতো কিন্তু তা গ্রহণের জন্য কাউকে পাওয়া যেত না। পরে মরুভূমিতে গিয়ে যে পথে কাফেলাগুলো যায় সেই পথে গ্রহণকারীর সন্ধান করত। সরাইখানাগুলো স্থানীয় লোকেদের প্রদত্ত ফল ও ফসল উপচে পড়ত। সামাজিক নিরাপত্তা এতদূর গিয়েছিল যে, একটি যুবতী মেয়ে একা দিবসে ও রাতে শত শত ক্রোশ পথ মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় অতিক্রম করত। তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হতো না। রাস্তায় যে কোনো মূল্যবান জিনিস খোয়া গেলে তা নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেত, কেউ তসরুপ করত না। ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনীসহ সে সময়ের লেখকদের লেখা বইগুলো থেকে সোনালি যুগের এ

চিত্র দেখা যায়। ড. ইউনুস এমন একটি অর্থনীতির প্রস্তাব করেন যার ফোকাস বা কেন্দ্রবিন্দু হবে ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে জাতির স্বার্থ। ইসলামের অর্থনীতি মূলত সামাজিক দান ভিত্তিক। দান মানে ভিক্ষা প্রদান নয়, দান মানে মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থ অবদান রেখে নিজের মনুষ্যজন্মকে সার্থক করার উপায়।

ইসলামের অর্থনীতির মূল ভিত্তি অর্থাৎ যে নীতির উপর এ ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে সেটা মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী তুলে ধরেছেন। পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্রের নীতি হলো জনসাধারণের সম্পদ সাপটে এনে এক বা একাধিক স্থানে জড়ো করা। সমাজতন্ত্রের নীতি হলো জনসাধারণের সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে তুলে নেওয়া। মূলে একই কথা, দু'টোই জনসাধারণকে বঞ্চিত করা। পুঁজিবাদে দেশের, জাতির সম্পদ পুঞ্জীভূত করে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের হাতে ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে। যার ফলভোগ করে অতি অল্পসংখ্যক লোক এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বঞ্চিত করে বিরাট ধনী হয়ে যায়। আর সমাজতন্ত্র দেশের জাতির সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাষ্ট্রের হাতে। জনসাধারণকে দেয় তাদের শুধু খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো প্রাথমিক, মৌলিক প্রয়োজনগুলি, যদিও কার্যক্ষেত্রে তাও সুষ্ঠুভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করে হাতে গোনা কতকগুলি কোটিপতি সৃষ্টি হয়, বাকি জনসাধারণ জীবনের প্রাথমিক মৌলিক প্রয়োজনগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এই ব্যবস্থা যতটুকু পরিধিতে প্রয়োগ করা হবে ততটুকু পরিধিতেই ঐ ফল হবে। একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে যেমন ঐ রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্যের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কোটিপতি সৃষ্টি হবে ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীময় প্রয়োগ করলে কয়েকটি ভৌগোলিক রাষ্ট্র বিপুল ধনী হয়ে যাবে আর অধিকাংশ রাষ্ট্র চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হবে যেমন বর্তমানে হয়েছে। এর কারণ হলো একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সম্পদ যেমন সীমিত- তেমনি পৃথিবীর সম্পদও সীমিত। সীমিত যে কোন জিনিসকেই কোথাও একত্রিত করা, পুঞ্জিভূত করা মানেই অন্যস্থানে অভাব সৃষ্টি করা। একটা রাষ্ট্রের ভেতরই হোক, আর সমস্ত পৃথিবীতেই হোক, সেটার সম্পদ, যা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কথা, সেটাকে যদি কোথাও পুঞ্জীভূত করা হয় তবে অন্যত্র অভাব সৃষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সমাজবাদী, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট (Socialist, Capital & Communist) এই সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের তৈরি ব্যবস্থা। সুতরাং এর পরিণাম অবশ্যই অন্যায়-অবিচার। অন্যদিকে শেষ জীবন-ব্যবস্থায় অর্থনীতির প্রণেতা স্বয়ং স্রষ্টা, আল্লাহ। এই ব্যবস্থার ভিত্তি নীতি হচ্ছে সম্পদকে মানুষের মধ্যে দ্রুত গতিতে চালিত করা, কোথাও সঞ্চিত হতে না দেওয়া। পুঁজিবাদ বলছে সম্পদ খরচ না করে সঞ্চয় কর; সবার সঞ্চয় একত্র কর, পুঞ্জীভূত কর (ব্যাংকে), আল্লাহ কোর'আনে বলছেন খরচ কর, ব্যয় কর, সম্পদ জমা করো না, পুঞ্জীভূত করো না। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত। একটায় সঞ্চয় কর অন্যটায় ব্যয় কর। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করে জাতির সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জীভূত করে। এটাও ইসলামের বিপরীত। কারণ, ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে না। এককথায় বললে বলতে হয় ইসলামের অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব চালিত করা, কোথাও যেন সেটা স্থবির-অনড় না হতে পারে। এই জন্যই কোর'আনে এই অর্থনীতির প্রণেতা বহুবার তাগিদ দিয়েছেন খরচ কর, ব্যয় কর, কিন্তু বোধহয় একবারও বলেন নি যে, সঞ্চয় কর। যাকাত দেয়া, খারাজ, খুমস ও ওশর দেয়া এবং তার উপর সাদকা দান ইত্যাদিসহ প্রায় চব্বিশ রকম উপায়ে খরচের কথা এতবার তিনি বলেছেন যে, বোধহয় শুধুমাত্র তওহীদ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে প্রভু, হুকুমদাতা, ইলাহ বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং জেহাদ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে এতবার বলেন নি। কারণ, একটা জাতির এবং পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীতে অর্থাৎ যে কোন পরিধিতে সম্পদ যথাযথ এবং বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সঞ্চয় নয়, ব্যয়। একজনের হাতে থেকে অন্য জনের হাতে হস্তান্তর,

অর্থাৎ গতিশীলতা। প্রতিটি হস্তান্তর যত দ্রুত হতে থাকবে তত বেশি সংখ্যক লোক ঐ একই সম্পদ থেকে লাভবান হতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ধরুণ একটা এক টাকার নোট। এই নোটটা যার হাতেই পড়লো, সে যথা সম্ভব শীঘ্র সেটা খরচ করে ফেলল। সে খরচ যেমন করেই হোক, কোন কিছু কিনেই হোক বা দান করেই হোক বা কাউকে ধার দিয়েই হোক বা কোন ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেই হোক। ঐ নোটটা যদি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দশজন লোকের হাত বদলায় তবে ঐ এক দিনে নোটটা দশজন লোককে লাভবান করবে। আর যদি একশ জনের হাত বদলায় তবে একশ' জনকে লাভবান করবে। কারণ প্রতিবার হাত বদলাবার সময় দু'জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই লাভবান হতেই হবে। অর্থাৎ ঐ সীমিত সম্পদটা অর্থাৎ ঐ এক টাকার নোটটা যত দ্রুত গতিতে হাত বদলাবে যত দ্রুত গতিতে সমাজের মধ্যে চালিত হবে তত বেশি সংখ্যক লোককে লাভবান করবে; তত বেশি সংখ্যক লোক অর্থনৈতিক উন্নতি করবে এবং পরিণতিতে সমস্ত সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করবে, সম্পদশালী করবে। সেই নোটটা যদি সমস্ত দিনে কোন হস্তান্তর না হয়ে কোন লোকের পকেটে বা কোন ব্যাংকে পড়ে থাকে তবে ওটার আসল মূল্য এক টুকরো বাজে ছেঁড়া কাগজের সমান। কারণ সারাদিনে সেটা সমাজের মানুষের কোন উপকার করতে পারলো না, কারো অথনৈতিক উন্নতি করতে পারলো না। আবার বোলছি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের অর্থনীতির বুনিয়াদ-ভিত্তি হলো সম্পদের দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিশীলতা (Fast and still faster circulation of wealth)।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অর্থ সম্পদের কৃপণতা, অলস পূঞ্জীভূত করণ এবং অনুৎপাদনশীল সঞ্চয় যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সম্পদের অপব্যবহার, অপব্যয় এবং অপচয়ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ বলতে পারেন- কেন? টাকার নোটটা অর্থাৎ সম্পদ পকেটে থেকে গেলে, বাক্সে ভরে রাখলে না হয় বুঝলাম ওটা উৎপাদনহীন, নিষ্ফল হয়ে গেল কিন্তু ব্যাংকে জমা পুঁজি তো বিনিয়োগ করা হয় এবং তা উৎপাদনে লাগে। ঠিক কথা কিন্তু ব্যাংকে জমা করা ঐ পুঁজি বিনিয়োগের গতি স্বাধীন মুক্ত হস্তান্তরের চেয়ে বহু কম, কোন তুলনাই হয় না। ব্যাংকের সম্পদ বিনিয়োগ করতে বহু তদন্ত, আইন-কানুন লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এবং তারপরও ঐ বিনিয়োগের সুফল ভোগ করে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ। শুধু ঐ শ্রেণিটি- যে শ্রেণিটি ইতিমধ্যেই সম্পদশালী, জনসাধারণের অনেক উর্ধ্বে। ব্যাংক কি যে চায় তাকেই পুঁজি ধার দেয়? অবশ্যই নয়। যে লোক দেখাতে পারবে যে, তার আগে থেকেই যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু আরো চাই, শুধু তাকেই ব্যাংক পুঁজি ধার দেয়, এটা সবারই জানা। যার কিছু নেই, যে ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বন্ধক দিতে পারবে না তাকে ব্যাংক কখনো পুঁজি ধার দেয় না, দেবে না। এক কথায় তৈলাক্ত মাথায় আরও তেল দেয়া, ধনীকে আরো ধনী করা, গরিবকে আরও গরিব করা। অনেক ব্যাংক, এনজিও ইত্যাদি গরিব মানুষকেও ঋণ দিয়ে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে সেটা বহুগুণ সুদে আসলে উসুল করে, প্রয়োজনে ভিটেবাড়ি দখল করে নিয়ে সেই টাকা আদায় করে। সুতরাং ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন অসম্ভব। শেষ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয় নি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। জনসাধারণকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কোন অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকেও নিষিদ্ধ করতে হয় নি। কারণ সম্পদের ঐ দ্রুত গতিই কোথাও সম্পদকে অস্বাভাবিকভাবে পুঞ্জিভূত হতে দেবে না। পানির প্রবল স্রোত যেমন বালির বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, সম্পদের স্রোত তেমনি কোথাও সম্পদকে স্তূপীকৃত হতে দেবে না। অথচ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টার যে শক্তিশালী সুফল তারও ফল ভোগ করবে সমাজ।

ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক অর্থ ও বাণিজ্যনীতি পৃথিবীকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় বলে ড. ইউনুস অভিমত ব্যক্ত করেছেন যা এক সরল সত্য। তিনি বলেছেন, ব্যক্তিগত মুনাফাকেন্দ্রিক বাণিজ্যনীতি দিয়ে কেউ কোনোদিন বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারবে না। প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রায় গলদ রয়েছে। এর ফলে পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে

না। পৃথিবীকে বাসের অনুপযোগী করে তুলছি। পৃথিবীর সম্পদ অশেষ নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল ভূমিকার মাধ্যমে এটি বাড়ানো যায়। আমাদের এখনই ঠিক করতে হবে, আমাদের প্রজন্ম কতটুকু ভোগ করবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কতটুকু রেখে যাব।

ড. ইউনুস তিনটি পি'র প্রতি উদ্যোক্তাদের নজর দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "বিদ্যমান ব্যবসা পদ্ধতিতে ব্যক্তির বা উদ্যোক্তার নজর শুধু একটি পি'তে। এই পি হলো প্রফিট বা লাভ। কিন্তু অপর দুই পি অর্থাৎ পিপল ও প্লানেট বা মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি নজর দিতে হবে। তাদের সাফল্যও এ তিন পি বিবেচনায় নিয়ে মাপা দরকার। বন-গাছ আছে বলে পৃথিবী ও মানুষ টিকে আছে। মানুষ সেই বন-গাছ উজাড় করে দিচ্ছে। স্বার্থপর হতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে নিজেদেরও ক্ষতি করছে। আমরা অনেক বর্জ্য তৈরি করছি ও সমুদ্রে ফেলছি। সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে বিশাল পরিমাণ বর্জ্য জমে গিয়ে পরিবেশের প্রতি মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে। কার্বন নিঃসরণের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। বিদ্যমান অর্থনীতির কাঠামোতে ধনী বা শক্তিশালী ব্যক্তি আরো বড় হচ্ছে, উপরে উঠছে। আর নিচের মানুষ আরো তলানিতে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। সবার জন্য সুষম না হোক, অন্তত গ্রহণযোগ্য ভোগের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু মানুষ শুধু স্বার্থপর নয়, স্বার্থহীনও। বিভিন্ন গুণের অমিত আধার মানুষ। তাই স্বার্থহীনতার গুণ দিয়ে স্বার্থপরতাকে পরাজিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অপরকে সুখী করাই সবচেয়ে সুখকর বিষয়।"

তার এ অনুভবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, যে অর্থনীতি পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে সেটি আমাদের কাছে আছে। আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তায় বা তাঁর অসীম জ্ঞানের সম্বন্ধে যারা বিশ্বাসী নন তারা যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, চৌদ্দশ' বছর আগে মানুষ সমাজের যে অবস্থা ছিল সেখানে হয়তো এই জীবনব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল এবং ঐ অকল্পনীয় ফল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এখন ঐ পুরনো ব্যবস্থা আর সেরূপ ফল দেখাতে পারবে না। এ কথায় আমাদের জবাব হচ্ছে, অবস্থার পারিপার্শ্বিকতায় বহু বিষয় বদলে যায়। অনেক বিষয় অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কিন্তু অনেক বিষয় আছে যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, এর কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন: একটি মানুষের নাকে সজোরে ঘুসি মারলে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হবে, লক্ষ বছর আগে এই ঘুষি মারলে তখনও রক্ত বের হোত, আজও বেরোয়, লক্ষ বছর পরেও মানুষের নাকে ঘুষি মারলে রক্ত বেরোবে। এর কোন পরিবর্তন নেই। জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ মানুষ সমাজে যে ক্ষতি করে, ধনী-দরিদ্রের যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে তা লক্ষ বছর আগেও করত, এখনও করছে এবং আজ থেকে লক্ষ বছর পরেও এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি মানবজীবনে প্রয়োগ করলে একই বিষময় ফল সৃষ্টি করবে। এমনি বহু জিনিস আছে যা শাশ্বত অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এই শেষ জীবনবিধান (দীন) তেমনি সেইসব অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা পৃথিবীর বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্তন হবে না। এই জন্য এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকৃতিক দীন (সুরা রূম ৩০)। এই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐ সব অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে মানবজাতির বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকে। কাজেই চৌদ্দশ' বছর আগে এই জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রয়োগে যে ফল হয়েছিল, বর্তমানে প্রয়োগ করলেও সেই একই ফল হবে এবং লক্ষ বছর পরে প্রয়োগ করলেও সেই অকল্পনীয় ফলই হবে। তবে একটি বিষয় পাঠককে মনে রাখতে হবে, এখানে আমরা যে জীবনব্যবস্থা (দীন) প্রতিষ্ঠার কথা বলছি আর বর্তমানে ইসলাম বলে যে ধর্মটি চালু আছে এই দু'টি এক জিনিস নয়। আমরা সেই প্রকৃত ইসলামের কথা বলছি যা আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, সেটিই আবার আমরা মাননীয় এমামুয্যামানের মাধ্যমে লাভ করেছি এবং যা বর্তমানে অসংখ্য সংকটে নিমজ্জিত মানবজাতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

মক্কার কাফেররাও নামাজ-রোজা করত

রাকীব আল হাসান

আল্লাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যত নবী ও রসুল পৃথিবীর বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি একটি অভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা হলো বালাগ। নবী ও রসুলগণ প্রত্যেকে তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়কে বলেছেন, "আমাদের দায়িত্ব তো কেবলমাত্র সুস্পষ্টভাবে সংবাদ পৌঁছে দেয়া" (সুরা ইয়াসীন ১৭)। এখানে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন "বালাগুল মুবীন" যার অর্থ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিছুর সংবাদ পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দেওয়াই ছিল নবী-রসুলদের একমাত্র কাজ, কে সেটা গ্রহণ করবে আর কে প্রত্যাখ্যান করবে সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়, সেটা আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। রসুলাল্লাহ মক্কার যে কাফের মোশরেকদের বালাগ শুরু করলেন সেই কাফের মোশরেকরাও কিন্তু বর্তমান মুসলিম দাবিদার এই জাতির মতো নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি উপাসনা করত কিন্তু তারা আল্লাহ কে 'ইলাহ' বা হুকুমদাতা হিসাবে মানতো না। আজকের মুসলিম দাবিদাররাও নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি উপাসনাতে ব্যস্ত কিন্তু আল্লাহকে 'ইলাহ' বা হুকুমদাতা হিসাবে মানছে না ফলে তাদের পরিণতিও কি একই হবার কথা নয়? তাই মুসলিম দাবিদার এ জাতির প্রতি এই বালাগ।

ইসলামের বালাগ কাদের প্রতি:

মক্কার ১৩ বছরের জীবনে রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ কাফের মোশরেকদেরকে সালাহ, সওম ইত্যাদি কোন আমলের দিকে আহ্বান করেন নি, তাঁরা আহ্বান করেছেন কেবলমাত্র কলেমার দিকে, তওহীদের দিকে। অনেকে মনে করেন মক্কার সেই কাফেরদের আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান ছিল না। এ ধারণাটি সঠিক নয়। সেই মোশরেকরাও আল্লাহর একত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুম, বিধান মানতো না অর্থাৎ তারা আল্লাহর আনুগত্য করত না। তখনকার আরবরা বিশ্বাস করত যে তারা আল্লাহর নবী ইবরাহীমের (আ.) উম্মাহ। তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে, পালনকারী বলে বিশ্বাস করত, নামাজ পড়ত, কাবা শরীফকে আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করত, ঐ কাবাকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক হজ্ব করত, কোরবানি করত, রোজা রাখত, আল্লাহর নামে কসম করত, এমনকি খাৎনাও করত। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় দলিল, বিয়ে শাদীর কাবিন ইত্যাদি সমস্ত কিছু লেখার আগে আমরা যেমন 'বিসমিল্লাহ' লেখি তেমনি তারাও আল্লাহর নাম লিখত। আরবের মোশরেকরা যে আমাদের মতোই আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিল এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। কোর'আনে তিনি তাঁর রসুলকে বলছেন- তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- সেই সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) (সুরা যুখরুফ- ৯)। অন্যত্র বলেছেন- তুমি যদি তাদের প্রশ্ন করো আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে তাদের (কর্তব্য কাজে) নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণ করছেন, তবে তারা নিশ্চয়ই জবাব দেবে- আল্লাহ (সুরা আনকাবুত- ৬১)।

এমন আরও অনেকগুলি আয়াত এবং ইতিহাস থেকে দেখা যায় সেই মোশরেকদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের ওপর ঈমান ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত ঠিকই কিন্তু ওগুলোকে তারা স্রষ্টা বলে মানতো না। তারা বিশ্বাস করত যে ঐ দেব-দেবীকে মানবে, ওগুলোর পূজা করবে তাদের জন্য ঐ দেব-দেবীরা আল্লাহর কাছেই সুপারিশ করবে (সুরা ইউনুস- ১৮, সুরা যুমার ৩)। এত ঈমান সত্ত্বেও তারা কাফের ছিল কারণ তারা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন নিজেদের মনগড়া নিয়ম-কানুন দিয়ে পরিচালনা করত। যেহেতু তারা আল্লাহর প্রদত্ত হুকুম মানতো না, তাই তাদের ঐ ঈমান ছিল অর্থহীন, নিষ্ফল এবং স্বভাবতই আল্লাহর হুকুম না মানার পরিণতিতে তাদের সমাজ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা, সংঘর্ষ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ ছিল। ঠিক আজকেও আল্লাহর প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আল্লাহর হুকুম,

আইন, বিধান অমান্য করার ফলে আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীও চরম অন্যায় ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

একইভাবে বর্তমানে 'মুসলিম' বলে পরিচিত জনসংখ্যাটি তদানীন্তন আরবের মানুষের মতোই আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তাকে স্রষ্টা বলে, জীবন-মরণের প্রভু বলে মানে, কিন্তু আরবের ঐ মোশরেকদের মতোই তাঁর দেয়া দীন, জীবন-বিধান মোতাবেক সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনা করে না। আরবের মোশরেকেরা দেব-দেবীর পুরোহিতদের দেয়া বিধান অনুযায়ী তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করত, বর্তমানের মুসলিম দুনিয়া নতুন দেব-দেবী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের পুরোহিত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা জীবন-বিধান অনুযায়ী তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করছে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে আরবদের হাবল, লা'ত, মানাতের মূর্তিগুলি ছিল কাঠ এবং পাথর দিয়ে তৈরি, বর্তমানের মূর্তিগুলি কাঠ পাথরের নয়, তন্ত্রের মূর্তি। বরং এই তন্ত্রের মূর্তিগুলোর পূজা ঐ কাঠ পাথরের মূর্তিপূজার চেয়েও বড় শেরক ও কুফর। তাহলে বিশ্বনবী যাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন আরবের সেই আল্লাহয় বিশ্বাসী অথচ মোশরেক কাফেরদের সঙ্গে বর্তমানের আল্লাহয় বিশ্বাসী কিন্তু কার্যতঃ মোশরেক 'মুসলিম' জনসংখ্যার তফাৎ কোথায়? এজন্যই আল্লাহর রসুল মক্কার ঐ আল্লাহ-বিশ্বাসী কাফের মোশরেকদেরকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদের বালাগ দিয়েছিলেন, আর একই কারণে মাননীয় এমামুয্যামান মানবজাতিকে তওহীদ মেনে নেওয়ার আহ্বান করেছেন।

> ***"মক্কার মোশরেকদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের ওপর ঈমান ছিল। তারা মূর্তিপূজা করত ঠিকই কিন্তু ওগুলোকে তারা স্রষ্টা বলে মানতো না। (সুরা ইউনুস-১৮, সুরা যুমার ৩)। এত ঈমান সত্ত্বেও তারা কাফের ছিল কারণ তারা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন নিজেদের মনগড়া নিয়ম-কানুন দিয়ে পরিচালনা করত।***

তওহীদের বালাগ চিরন্তন:

আল্লাহ শেষ রসুলকে (সা.) বলছেন, 'আপনার পূর্বে আমি যে রসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ (সার্বভৌমত্বের মালিক বা হুকুমদাতা) নেই (সুরা আম্বিয়া ২৫)। অর্থাৎ সকল নবী ও রসুলগণের বালাগ ছিল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি অর্থাৎ তওহীদের প্রতি। আল্লাহ ছাড়া জগতের সকল বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তওহীদ, এটাই এই দীনের ভিত্তি। সংক্ষেপে এর মর্মার্থ হচ্ছে আমি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য আছে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি যে বিভাগেই হোক না কেন, সেই ব্যাপারে আমি আর কারও নির্দেশ মানি না। যে বিষয়ে আল্লাহ অথবা তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য নেই সে বিষয়ে আমরা স্বাধীনভাবে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। বর্তমান দুনিয়ার কোথাও এই তওহীদ নেই, সর্বত্র আল্লাহকে কেবল উপাস্য বা মা'বুদ হিসাবে মানা হচ্ছে, কিন্তু ইলাহ বা সার্বভৌমত্বের আসনে আল্লাহ নেই। মানুষ নিজেই এখন নিজের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন চালাচ্ছে, মানুষ নিজেই এখন ইলাহ অর্থাৎ বিধাতার আসনে আসীন। আজ মানুষের তৈরি জীবন-ব্যবস্থাগুলিকেই (দীন) মানবজীবনের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান হিসাবে মনে করা হচ্ছে যদিও সেগুলির সবই মানুষকে শান্তি দিতে চরমভাবে ব্যর্থ। বর্তমান দুনিয়ার সীমাহীন মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, অনাচারই এই ব্যবস্থাগুলির ব্যর্থতার যথেষ্ট প্রমাণ।

সূর্য যখন উদিত হয় কোনোকিছু দিয়েই তার আলোকে আড়াল করে রাখা যায় না, তেমনি আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম, সত্যদীনকেও ঢেকে রাখা যাবে না, এর আলো উদ্ভাসিত হবেই হবে। সত্যসন্ধানী মানুষেরা এখন আল্লাহর দয়ায় একটু একটু করে বুঝতে পারছেন যে তওহীদের এই বালাগ আল্লাহর রসুলের সেই সত্যদীনের বালাগ যা মানবজাতিকে অন্যায়-অশান্তি থেকে মুক্ত করে শান্তির জীবন উপহার দেবে।

কলেমার বাণীকে কেবল যেকেরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়ে মানবজাতির মধ্য থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়-অশান্তি, অবিচার লুপ্ত করে পৃথিবীকে একটি শান্তিময় জান্নাতের বাগানে পরিণত করার সময় এখনই।

মাননীয় এমামুয্যামানের লেখা থেকে সম্পাদিত

প্রকৃত ইসলাম বনাম ব্রিটিশদের শেখানো ইসলাম

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসাহ বর্তমানে আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়েছে। এটি ১৭৮০ সনে লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশদের তৈরি বিকৃত ও বিপরীতমুখী একটি ইসলাম মুসলিম নামক এই জনসংখ্যার অস্থি-মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া। তারা এই কাজে পুরোপুরি সফল হয়েছে। আজ যেটাকে ইসলাম মনেকরে এই জাতি অতি আন্তরিকতার সাথে পালন করছে তা ব্রিটিশদের শেখানো বিকৃত ও বিপরীতমুখী সেই ইসলাম।

আল্লাহর রসুল চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলামের যে শেষ সংস্করণটি মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন সেটি এবং বর্তমানে আমরা ইসলাম বলে পরিচিত যে দীনটি পালন করছি এই দুইটি যে শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দু'টি পথ তার ভুরি ভুরি প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। এরই একটি হলো প্রকৃত ইসলামের চরিত্র এবং বর্তমানে ইসলামের নামে চলা বিকৃত ও বিপরীতমুখী দীনটির চরিত্রের আকাশ পাতাল ফারাক। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহর অবতীর্ণ ইসলামের চরিত্র হচ্ছে বহির্মুখী অর্থাৎ Extrovert এবং বিস্ফোরণমুখী অর্থাৎ Explosive এবং বর্তমানে আমাদের ইসলাম বিকৃত হয়ে- হয়ে গেছে অন্তর্মুখী, Introvert এবং সংকোচনশীল অর্থাৎ Implosive। বিকৃত এবং বিপরীতমুখী এই ইসলামকেই আমরা সঠিক ইসলাম মনে করে যথাসাধ্য তা পালন করার চেষ্টা করছি। ইসলামের অতি ছোট বিষয় থেকে শুরু করে এই এত বড় ভুল, এত বড় গোমরাহীর কারণ কী? এর কয়েকটি কারণ আছে। সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে আকিদার বিকৃতি ও লোপ। আকিদার বিকৃতিতে এই দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার সংগ্রাম, জেহাদ ত্যাগ করে রাজত্ব করা আরম্ভ করায় আজ থেকে বহু শতাব্দী পূর্বেই আল্লাহ এই জাতির অভিভাবকত্ব ত্যাগ করেছেন এবং কোর'আনের সুরা তওবার ৩৯ নং আয়াতে তাঁর সাবধানবাণী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজত্ব ও রাষ্ট্রশক্তি এই জাতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান জাতিগুলির হাতে তুলে দিয়েছেন এবং মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটিকে তাদের দাস, গোলাম বানিয়ে রেখেছেন।

এখানে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে যখন মো'মেন মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে পরিচিত এই

জাতিটিকে আল্লাহ খ্রিষ্টানদের দিয়ে সামরিকভাবে পরাজিত করে দিলেন তখন স্বভাবতঃই এই জাতি আর প্রকৃতপক্ষে মো'মেন, মুসলিম বা উম্মতে মোহাম্মদী এর কোনটাই রইল না। কারণ কোর'আনে আল্লাহ একাধিকবার পরিষ্কার বলেছেন যে, সামরিক সংঘর্ষে মো'মেন জাতিকে কখনই তিনি শত্রুর হাতে পরাজিত হতে দেবেন না, এটা তাঁর সুন্নাহ, তাঁর চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সুন্নাহ (সুরা ফাতাহ ২২ এবং ২৩ নং আয়াত)। আল্লাহর রসুলও বলে গেছেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে তাঁর উম্মাহ কখনও শত্রুর কাছে সামরিকভাবে পরাজিত হবে না [সাওবান ও খাব্বাব (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ী]। খ্রিষ্টানদের হাতে সামরিক পরাজয়ই প্রমাণ করে দিলো যে আল্লাহর চোখে এই জাতি, জাতি হিসাবে মো'মেন রইল না এবং মো'মেন রইল না অর্থই মুসলিমও রইল না, উম্মতে মোহাম্মদীও রইল না।

এই জাতিকে দাসে পরিণত করার পরও খ্রিষ্টান জাতিগুলির মনে এই দাস জাতির সম্বন্ধে ভয় সম্পূর্ণ দূর হলো না, কারণ তখনও তাদের মন থেকে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ মুছে যায় নি যে, অতীতে এই জাতির হাতে কতবার তারা সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছিল। তারা জানত, যে জাতিকে তারা এখন পরাজিত ও পদানত করেছে সে জাতির প্রচণ্ড শক্তির উৎস হচ্ছে তাদের কোর'আন ও হাদিস। এই কোর'আন ও হাদিস এবং তাদের নবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই তাদের এক অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল যারা একদিন ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত তো করেছিলই, শুধু তাই নয় তাদের ইউরোপের মধ্যেও অর্ধেক ঢুকে পড়েছিল। তাই এই জাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত হবার জন্য, এই জাতিটিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেবার জন্য তারা এক শয়তানি ফন্দি আটল। সে ফন্দি হলো এই যে, সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় খ্রিষ্টানেরা যার যার অধিকৃত অংশে মুসলিমদের "ইসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। ইংরাজরা এই উপমহাদেশে, মালয়েশিয়ায়, মিশরে ইত্যাদিতে; ফরাসিরা আলজেরিয়া এবং অন্যান্য যে সব মুসলিম এলাকা দখল করেছিল সেখানে; ডাচ অর্থাৎ ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করল। ইংরাজ অধিকৃত এই উপমহাদেশের বড়লাট অর্থাৎ Viceroy মি. ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মাদ্রাসায় "ইসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা, যাদের ইংরেজিতে বলা হয় Orientalists, সম্মিলিতভাবে বহু গবেষণা করে একটি নতুন "ইসলাম" দাঁড় করালেন, যে "ইসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য ইসলামের মতোই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটার আকিদা এবং চলার পথ অর্থাৎ সেরাত, আল্লাহর রসুলের ইসলামের, সেরাতাল মোস্তাকেমের ঠিক বিপরীত। ঐ বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দিতে কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, কি কি বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে, কেমন করে শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ এক কথায় Syllabus এবং Curricullum নির্ধারণ ও স্থির করলেন ঐ খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা। ঐ Syllabus ও Curricullum এ আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদকে সংকুচিত করে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করা হলো, কারণ সার্বভৌমত্ব তো বৃটিশের, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দিলে তো তাদের রাজত্ব করাই বিপদজনক। তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে ঐ মাদ্রাসার পাঠ্যবস্তুতে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত করে প্রায় বাদ দেওয়া হলো। সমষ্টিগত, জাতিগত বিষয়গুলিকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়ে অতি সাধারণ ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে অতি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হলো। নামাজ, রোজা, বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, ওজু গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে ইসলামের অতি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উপরে স্থান দেয়া হলো। ঐ সিলেবাসে (Syllabus) আরও প্রাধান্য দেয়া হলো সেই সব বিষয়গুলিকে যেগুলি সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন মাজহাবে ও ফেরকায় মতভেদ ও বিতর্ক আগে থেকেই মওজুদ ছিল ও আছে। খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা এটা করলেন এই জন্য যে তাদের শেখানো ইসলামের আলেমরা যেন ঐগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, বাহাস ও প্রয়োজনে মারামারি করতে থাকে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে এবং তাদের শাসন নিরাপদ হয়। এই দাস জাতির আরেকটি অংশ, যেটি আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য তাসাওয়াফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল তাদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ

খ্রিষ্টানদের কোন দুঃশ্চিন্তা ছিল না। কারণ তারা জানত ঐ অংশটি তসবিহ হাতে খানকায়, হুজরায় আর মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ আছে; সমাজ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আল্লাহর আইন মোতাবেক চলছে, না খ্রিষ্টান বা হিন্দু বা ইহুদিদের আইনে চলছে সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। শুধু ঐটুকু করেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হলো না। আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের সৃষ্ট "ইসলাম" শিক্ষা দিতে কোথাও

> *যখন মো'মেন মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে পরিচিত এই জাতিটিকে আল্লাহ খ্রিষ্টানদের দিয়ে সামরিকভাবে পরাজিত করে দিলেন তখন স্বভাবতঃই এই জাতি আর প্রকৃতপক্ষে মো'মেন, মুসলিম বা উম্মতে মোহাম্মদী এর কোনটাই রইল না। কারণ কোর'আনে আল্লাহ একাধিকবার পরিষ্কার বলেছেন যে, সামরিক সংঘর্ষে মো'মেন জাতিকে কখনই তিনি শত্রুর হাতে পরাজিত হতে দেবেন না, এটা তাঁর সুন্নাহ, তাঁর চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সুন্নাহ (ফাতাহ ২২, ২৩)।*

কোন বাধা না আসতে পারে সে জন্য মাদ্রাসা পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতাসহ অধ্যক্ষ পদটি তারা নিজেদের হাতেই রাখল। প্রথম অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হলেন Dr. A. Springer M.A। ১৭৮০ থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত এই ১৪৬ বছর একাদিক্রমে ২৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে থেকে এই জাতিকে "ইসলাম" শিখিয়েছেন। তারা কোন "ইসলাম" শিখিয়েছেন? অবশ্যই তারা আল্লাহ রসুলের সেই প্রকৃত ইসলাম সেখান নি, যে ইসলামের সৃষ্ট দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের হাতে তারা বার বার পরাজিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালিয়ে যেয়েও নিস্তার পান নি, যে যোদ্ধারা তাদের তাড়া করে ইউরোপের মধ্যে অর্ধেক ঢুকে পড়েছিল। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিতে শিখিয়েছেন তাদের তৈরি করা এমন একটি ইসলাম যেটা তৈরি করে মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষ, যারা দাড়ি, মোচ, টুপি, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ, হায়েয-নেফাস, যিকির আসকার আর বিবি তালাককেই ইসলাম মনে করে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাহাস আর মারামারি করতে থাকে যাতে খ্রিষ্টানরা নিশ্চিন্ত মনে তাদের দাসদের ওপরে রাজত্ব করতে পারে। ১৪৬ বছর ধরে নিজেদের তৈরি "ইসলাম" শেখাবার পর ২৬ নং খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ Mr. Alexander Hamilton Harty ১৯২৭ সনে অধ্যক্ষপদ শামসুল ওলামা, কামাল উদ্দিন আহমদ এম.এ.আই.আই.এস এর হাতে ছেড়ে দেন।

[দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]।

আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজেদের সাফল্য দেখে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশসহ তাদের অধিকৃত অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতেও আলীয়া মাদ্রাসার অনুকরণে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের তৈরি "ইসলাম" শিক্ষা দেয়। ইংরাজ চলে গেছে কিন্তু তাদের তৈরি করা "ইসলাম" আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ঐ মাদ্রাসাগুলি থেকেই ঐ ইসলাম শিখে আলেমরা বের হয়ে আসছেন ও আমাদের ঐ "ইসলাম"ই শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা আজ ইসলাম বলতে সেই ইসলামই বুঝি যে "ইসলাম" খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তৈরি করে ১৪৬ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। ফলে আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হচ্ছে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানদের তৈরি করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের তৈরি করা "ইসলাম" দিয়ে, আল্লাহ রসুলের ইসলাম দিয়ে নয়। ভাবতে অবাক লাগে এরপরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা করি।

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

তাহাজ্জুদ যখন ঘুম নষ্ট রোজা যখন উপবাস

ভবিষ্যতে মুসলিম নামধারী এই জাতিটির কতখানি আকীদা বিচ্যুতি ঘটবে এবং তার দরুন তারা যে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বহিরাগত হয়ে যাবে তা বোঝাতে গিয়ে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে রসুলাল্লাহ বলেন- 'এমন সময় আসবে যখন ইসলাম শুধু নাম থাকবে, কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, মসজিদসমূহ লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট জীব, তাদের তৈরি ফেতনা তাদের উপরই পতিত হবে। (আলী (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত)। আবার একই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অপর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, "এমন সময় আসবে যখন মানুষ রোযা করবে তা শুধু না খেয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকা হবে, (অর্থাৎ রোযা হবে না) এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়বে তা শুধু ঘুম নষ্ট করা হবে" (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ হবে না)। এই হাদিসগুলোতে মহানবী (সা.) কাদের বোঝাচ্ছেন? প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে- ইসলাম শুধু নাম থাকবে। অর্থাৎ ইসলাম শুধুমাত্র নামের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কার্যত ইসলামের নামে যেটা চলবে সেটা প্রকৃত ইসলাম হবে না। আর যেটা প্রকৃত ইসলাম নয় তার অনুসারীরাও যে প্রকৃত মুসলিম নন- তা বোঝা যায় সাধারণ জ্ঞানেই। আবার একই হাদিসে তিনি বলেছেন- মসজিদসমূহ লোকে লোকারণ্য হবে, কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না। এখানেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ মানুষ মসজিদে যাবে, সেখানে গিয়ে আল্লাহর এবাদত করবে, নামাজ পড়বে কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও তাদের মধ্যে হেদায়াত থাকবে না। আর হেদায়াত না থাকার মানেই হলো তারা হবে পথভ্রষ্ট।

আবার দ্বিতীয় হাদিসে তিনি মানুষ বলতে তাদেরই বোঝাচ্ছেন যারা নিজেদের মুসলিম বলে মনে করে। কারণ তিনি অন্য নবীদের উম্মত খ্রিষ্টান-ইহুদিদের সম্বন্ধে বলছেন না। দ্বিতীয় কথা হলো হাজারো রকমের এবাদতের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি তিনি বেছে নিয়েছেন। একটি রোযা অন্যটি তাহাজ্জুদ। তৃতীয় হলো এর একটা ফরদ-বাধ্যতামূলক, অন্যটি নফল-নিজের ইচ্ছাধীন। বিশ্বনবী (সা.) পাঁচটি বাধ্যতামূলক ফরয এবাদত থেকে একটি এবং শত শত নফল এবাদত থেকে একটি বেছে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো এই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে আল্লাহ রসুল ও দীনের উপর পরিপূর্ণ ঈমান ছাড়া কারো পক্ষে এক মাস রোযা রাখা বা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব নয়। এমনকি মোকাম্মেল ঈমান আছে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা তাহাজ্জুদ পড়েন না। অর্থাৎ রসুলাল্লাহ বোঝাচ্ছেন তাদের যাদের পরিপূর্ণ দৃঢ় ঈমান আছে আল্লাহ-রসুল-কোর'আন ও ইসলামের উপর। এই হাদিসে তিনি মোনাফেক বা লোক দেখিয়ে করা যায় অর্থাৎ রিয়াকারীদের বোঝান নি। কারণ যে সব এবাদত লোক দেখিয়ে করা যায় অর্থাৎ মসজিদে যেয়ে নামায-হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি একটিও উল্লেখ করেন নি। মোনাফেক রিয়াকারী বোঝালে তিনি অবশ্যই এগুলি উল্লেখ করতেন যেগুলি লোক দেখিয়ে করা যায়। তিনি ঠিক সেই দু'টি এবাদত উল্লেখ করলেন যে দুটি মোনাফেক ও রিয়াকারীর পক্ষে অসম্ভব, যে দু'টি লোকজন দেখিয়ে করাই যায় না, যে দুটি পরিপূর্ণ ঈমান নিয়েও সবাই করতে পারে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ভবিষ্যত বাণী করেছেন যে এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মতের মানুষ পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সর্ববিধ এবাদত করবে কিন্তু কোন কিছুই

হবে না, কোন এবাদত গৃহীত-কবুল হবে না। যদি দীর্ঘ এক মাসের কঠিন রোযা এবং মাসের পর মাস বছরের পর বছর শীত-গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করা তাহাজ্জুদ নিষ্ফল হয়, তবে অন্যান্য সব এবাদত অবশ্যই বৃথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা শুধু পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অর্থাৎ মোকাম্মল ঈমানদারই নয়, রোযাদার ও তাহাজ্জুদীও, তাদের এবাদত নিষ্ফল কেন? তাছাড়া তাদের এবাদতই যদি বৃথা হয় তবে অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের এবাদতের কী দশা?

মহানবীর (সা.) ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে এই যে, তিনি যাদের কথা বলছেন তারা গত কয়েক শতাব্দী ও আজকের দুনিয়ার মুসলিম নামধারী জাতি। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) এই জাতির সম্মুখে যে উদ্দেশ্য স্থাপন করে দিয়েছিলেন আকিদার বিকৃতিতে জাতি তা বদলিয়ে অন্য উদ্দেশ্য স্থাপন করে নিয়েছে। আল্লাহ রসূলের (সা.) স্থাপিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, দুর্জেয় সংগ্রামী চরিত্রের প্রয়োজন, সেই চরিত্র তৈরির জন্য যে প্রশিক্ষণ- সেই প্রশিক্ষণ এবং আরও অন্যান্য ব্যাপারকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যই যেখানে নেই বা বিকৃত সেখানে প্রশিক্ষণের আর কোন দাম, অর্থ থাকতে পারে না। কাজেই ঐসব প্রশিক্ষণ অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সর্ব প্রকার এবাদত আজ নিষ্ফল, অর্থহীন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমার এই কথায় বর্তমানের এই জাতিটি- যেটা নিজেকে শুধু মুসলিম নয় একেবারে উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করে- এই জাতি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। বিশেষ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এই জাতির সেই অংশ যেটা আল্লাহ রসূলের কঠোর সতর্ক বাণী ও নিষেধ অগ্রাহ্য করে, সেরাতুল মোস্তাকীম ও দীনুল কাইয়্যেমা (জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধান ছাড়া সমগ্র বিধান অস্বীকার, সালাহ ও যাকাত প্রতিষ্ঠা) ত্যাগ করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফতোয়াবাজী করে জাতিকে শত টুকরোয় ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছেন এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে সেই অন্য অংশটি যেটা আত্মার উৎকর্ষ ও আল্লাহর সান্নিধ্যের নাম করে জাতির সম্মুখে আল্লাহ ও রসূলের (সা.) স্থাপিত উদ্দেশ্য বদলিয়ে অন্য উদ্দেশ্য স্থাপন করেছেন, যে জাতিকে বিশ্বনবী (সা.) মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সে জাতিকে সংগ্রাম ভুলিয়ে হাতে তসবিহ ধরিয়ে দিয়ে টেনে খানকায় বসিয়ে দিয়েছেন, জাতির বর্হির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্তর্মুখী করে তাকে কাপুরুষে পরিণত করেছেন, সিংহকে ইঁদুরে পরিণত করেছেন।

অকপট সত্যান্বেষী মন নিয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে জাতীয় জীবনে অস্বীকার করে মানুষের তৈরি জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিণতিতে পৃথিবীতে যে অন্যায়-অবিচার শোষণ-রক্তপাত হচ্ছে সে সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে সে সব থেকে মুখ ফিরিয়ে যারা মহা এবাদতে মশগুল হয়ে আছেন আল্লাহ বিরোধী আদর্শ প্রচারে যারা প্রচণ্ড বিরোধ গড়ে তুলছেন না, যারা নানাভাবে জাতির ঐক্য ধ্বংস করে যাচ্ছেন তারাই হচ্ছেন রসুলাল্লাহর (সা.) ঐ ভবিষ্যতবাণীর লক্ষ্য। আল্লাহ এই জাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি (উম্মাহ) কারণ মানবজাতির মধ্যে থেকে তোমাদিগকে উত্থিত করা হয়েছে এই জন্য যে (তোমরা মানুষকে) সৎ কার্য করার আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত করবে, আল্লাহকে বিশ্বাস করবে (কোর'আন- সুরা আলে-ইমরান ১১০)।" অর্থাৎ এই উম্মাহকে মানব জাতির মধ্য থেকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষকে অসৎ কাজ (আল্লাহর বিধানের বিরোধী কাজই হলো অসৎ কাজ) থেকে নিবৃত্ত করা ও সৎ কাজ (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজই হচ্ছে শুধু সৎকাজ) করার আদেশ করার জন্য এবং এই কাজ করার জন্যই সে জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। যে বা যারা এবাদতের নাম করে আল্লাহর যিকরের নাম করে বা যে কোন ছুতোয় বিরোধিতার ভয়ে, পার্থিব ক্ষতির ভয়ে, যে জন্য তাদের মানব জতির মধ্য থেকে উত্থিত করা সেই কাজ থেকে পালায় তবে সে বা তারা আর সেই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যেই নেই সুতরাং তাদের সব রকম এবাদত অর্থহীন, নিষ্ফল। (যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন ত্যাগ করা হয় তখন মানুষের কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। হাদিস তিরবানী।)

এইখানে আরও একটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। কোর'আনের এই আয়াতে আল্লাহ সৎকাজের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটা হলো আদেশ, আরবিতে 'আমর'। আদেশ তখনই করা যায় যখন সে আদেশকে কাজে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ কাজে

পরিণত করার শক্তি থাকে, নইলে খুব জোর অনুরোধ করা যায়। অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করার ব্যাপারেও তাই। মানুষকে অর্থাৎ সমাজকে সৎকাজ করার আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার শক্তি শুধু রাষ্ট্রের থাকে অন্য কারো নয়। অন্য যে কেউ করতে গেলে তাকে শুধু অনুরোধ বা কাকুতি-মিনতি করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ অনুরোধ শব্দ ব্যবহার করেন নি, করেছেন 'আমর' আদেশ অর্থাৎ ঐ কাজ করতে হবে রাষ্ট্রশক্তিতে। উপদেশ ও অনুরোধে যে ও কাজ হবে না তার প্রমাণ বর্তমান মানব সমাজ। এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ, অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা যে আল্লাহ উপদেশ, অনুরোধের মাধ্যমে করা বোঝান নি তা পরিষ্কার হয়ে যায় তার কোর'আনের আরেকটি আয়াতে। তিনি বলেছেন- এরা (মো'মেন) তারা, যাদের আমি তাদের পৃথিবীতে (বা পৃথিবীর যে কোন অংশে) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত (নামায) কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং ন্যায়, সৎ কাজের আদেশ দেয়, এবং অন্যায়, অসৎ কাজ থেকে বিরত করে (কোর'আন- সুরা আল-হজ ৪১)। এখানে লক্ষ্য করুন-মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ কী পূর্বশর্ত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন আমি তাদের পৃথিবীতে (বা পৃথিবীর যে কোন অংশে) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার পর, কারণ তিনি ভালো করেই জানেন যে, ন্যায় কাজের আদেশ ও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা এ দু'টোর কোনটাই সম্ভব নয় রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া। সুতরাং যারা অনুরোধ, উপদেশ, কাকুতি-মিনতি করে ঐ কাজ করতে চেষ্টা করছেন তারা পণ্ডশ্রম করছেন।

গুরুত্বের ওলট পালট প্রসঙ্গ সওম

ডা. মো. জাকারিয়া হাবিব

সওমের মাস আসলে যেভাবে ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়, মনে হয় যেন সওমই ইসলামের একমাত্র কর্তব্য। গণমাধ্যমগুলি ক্রোড়পত্র বের করে, প্রতিদিন পত্রিকায় বিশেষ ফিচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা শুরু হয়। টেলিভিশনে জাদরেল মওলানা, মৌলভীরা আলোচনার ঝড় তোলেন। কিছু ডাক্তার আসেন সওমের উপকারিতা বোঝাতে। সারারাত চলে হামদ ও নাত, শেষরাতে সেহরী অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে যেন এক এলাহি কাণ্ড। এটা প্রশংসাযোগ্য, কারণ ইসলামের একটি বিষয় যত বেশি আলোচিত হবে, সেটা মানুষের জীবনেও তত বেশি আচরিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যেখানে আল্লাহ কোর'আনে সওম ফরদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার আর সওম পালনের নিয়ম কানুন উল্লেখ করেছেন আর দুই/তিনটি আয়াতে, আর সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ফরদ হওয়ার কথা বলা হয়েছে বহুবার আর এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে প্রায় সাতশ'র মতো আয়াতে। সংগ্রাম সংক্রান্ত সব আয়াত একত্র করলে আট পারার মতো হয়ে যায়। মুমিনের সংজ্ঞার মধ্যেও আল্লাহ এই সংগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে (সুরা হুজরাত ১৫)।' এ সংজ্ঞাতে আল্লাহ সওমকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে করেছেন। শুধু তাই নয়, সওম পালন না করলে কেউ ইসলাম থেকে বহিষ্কার এ কথা আল্লাহ কোথাও বলেন নি, কিন্তু সংগ্রাম না করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন এবং পুরো জাতিকে অন্য জাতির গোলামে পরিণত করবেন (সুরা তওবা ৩৯)। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সংগ্রাম ছাড়া ইসলামের

এমন কোন আমল নেই যা পালন না করলে ইসলাম থেকে বহিঃষ্কার হবার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন, 'কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল- তোমাদের জন্য কিতাল (সংগ্রাম) ফরদ করা হলো (সুরা বাকারা ২১৬, ২৪৬, সুরা নিসা ৭৭)। ঠিক একই শব্দমালা ব্যবহার করে আল্লাহ সওমকেও ফরদ করেছেন- কুতিবা আলাইকুম সিয়াম (সুরা বাকারা ১৮৩)। একেবারে শব্দে শব্দে এক, কেবল এক স্থানে বলা হয়েছে কিতাল, আরেক স্থানে সিয়াম। আল্লাহ কোনও বিষয়ে একবার মাত্র হুকুম দিলেও সেটা অবশ্যই ফরদ ও গুরুত্বপূর্ণ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বিষয়টি একইভাবে ফরদ করা হলো এবং সেই কাজের বিষয়ে শত শত বার বলা হলো সেটির গুরুত্ব আর দুই তিনটি আয়াতে যে বিষয়টি বলা হলো এই উভয় কাজের গুরুত্ব কি সমান? নিশ্চয়ই নয়। মহান আল্লাহ কোর'আনে শত শতবার আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম সম্পর্কে বলার পরও এ প্রসঙ্গে কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। মিডিয়াতে তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি যে ইমাম সাহেব মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সিয়ামের ফজিলত নিয়ে সুরেলা ওয়াজে শ্রোতাদের মোহিত করেন, তিনিও ভুলেও জিহাদের নাম উচ্চারণ করেন না।

এর কারণ কী? এর কারণ সওম অতি নিরাপদ একটি আমল যা করলে সুঁইয়ের খোঁচাও লাগার আশঙ্কা নেই। এতে জীবনের ঝুঁকি নেই, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই, কোন কোরবানিরও প্রশ্ন নেই। পক্ষান্তরে সংগ্রাম এমন একটি কাজ যা করতে গেলে জীবন ও সম্পদের সম্পূর্ণ কোরবানি প্রয়োজন। আরেকটি কারণ হলো আজকের, দুনিয়াময় যে ইসলাম চালু আছে এটা আল্লাহ ও রসুলের ইসলাম নয়। ব্রিটিশ খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা বসিয়ে নিজেরা সিলেবাস carriculam তৈরি করে এই জাতিকে যে বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এটা সেই ইসলাম। এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদ নেই, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেই, কোন জাতীয় আইন-কানুন নেই, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি নেই; অর্থাৎ নামাজ, রোজা আর ব্যক্তিগত আমলসর্বস্ব অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই ধর্মের পণ্ডিতদের, আলেমদের কাছে দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ, রোজা, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি আর তওহীদ ও জিহাদ একেবারেই নিস্প্রয়োজন। অর্থাৎ যে দু'টি বিষয় ছাড়া মানুষ মুমিনই হতে পারবে না সে দু'টিকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামাজ পড়ুক বা রোজা রাখুক, আগে তো চাই মুমিন হওয়া, কাফেরের জন্য তো আর নামাজ রোজার দরকার নেই। সুতরাং যে ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই আর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নেই, সেই ইসলাম মৃত, আল্লাহর রসুলের ইসলামের বিপরীতমুখী একটি ধর্ম। এই বিকৃত ধর্মের উপাসনা ও আনুষ্ঠানিকতাগুলি মানুষ পালন করে আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় ও জান্নাত পাওয়ার আশায়। পবিত্র রমজান মাসে এই সমস্ত আমলের প্রতিদান অন্য সব মাসের চেয়ে সত্তর গুণ হবে এই আশায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ফরদ, ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল, মোস্তাহাব ইত্যাদি সর্বপ্রকার আমল প্রচুর পরিমাণে করে থাকেন এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছেন বলে পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। এর কারণ তওহীদহীন ইসলাম ইসলামই নয় এবং এই জাতি আল্লাহর দেওয়া মুমিনের সংজ্ঞা মোতাবেক মুমিনও নয়। আরেকটি মারাত্মক বিষয় হচ্ছে গুরুত্বের ওলটপালট। আল্লাহ এবং তাঁর রসুল যে বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, এই বিকৃত ইসলামে তাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়েছে; পক্ষান্তরে আল্লাহ-রসুল যে কাজের গুরুত্ব দিয়েছেন কম, সেটিকে মহাগুরুত্বপূর্ণ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইতিহাস ও বর্তমানের অসঙ্গতি

যারা কুফরী করেছে, তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মতো আহার করে। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম (সুরা মোহাম্মদ ১২)

রসুলাল্লাহ এবং সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা যেত। পণ্যসামগ্রির চাহিদা থাকত সবচেয়ে কম। তাঁরা কেনাকাটা না করে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখীদের দান সদকা করতেন। আর বর্তমানে রমজান মাস আসলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ মাসে খাওয়া দাওয়া বাবদ অধিকাংশ মানুষের ব্যয়ও হয় অন্য মাসের দ্বিগুণ। সংযমের মাস এলেই মুসলিম নামক জাতির সংযমের সব বাঁধ যেন ভেঙ্গে যায়। কি নিদারুণ পরিহাস!

দাজ্জাল শারীরিক দানব নয়

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

চৌদ্দশ' বছর থেকে মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনা চলে আসছে। আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব কথা বলে গেছেন, পৃথিবীতে কী কী ঘটনা ঘটবে সেগুলি সম্বন্ধে আভাস ও সরাসরি যা জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বিগ্নকর। উদ্বিগ্নকর ও ভীতিপ্রদ এই জন্য যে দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমগ্র মানবজাতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, সমস্ত মানবজাতিকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করবে। শুধু চেষ্টা নয়, বেশ কিছু সময়ের জন্য দাজ্জাল তার শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে গোটা মানবজাতিকেই বিপথে পরিচালিত করবে। কাজেই দাজ্জালকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার বা অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

আল্লাহর রসুল বলেছেন– আদমের সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় বা ঘটনা হবে না, যা দাজ্জালের চেয়ে গুরুতর ও সংকটজনক (হাদীস- এমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে মুসলিম)। তিনি এ কথাও বলেছেন যে- নুহ (আ.) থেকে নিয়ে কোনো নবীই বাদ যান নি যিনি তাঁর উম্মাহকে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেন নি (হাদীস- আবু ওবায়দা বিন যার্‌রাহ (রা.) ও আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে আবু দাউদ, বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযি)। শুধু তাই নয়, আল্লাহর নবী নিজে দাজ্জালের সঙ্কট (ফেত্‌না) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (হাদিস- আয়েশা (রা.) থেকে বোখারী)।

যে ব্যাপারটা মানবজাতির সৃষ্টি থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়, সেটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা সে সম্বন্ধে কতটুকু সজাগ ও সচেতন? বাস্তব অবস্থা এই যে আমরা মোটেই সজাগ নই এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে আমাদের কোনো মাথাব্যথাই নেই। যে ঘটনাটিকে আখেরি নবী আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন সেই মহা-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমাজের আলেম সাহেবরাও কোনো গভীর গবেষণা করেন নি। এই মহা-প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য যতটুকু শ্রম দিয়েছেন তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি শ্রম ও সময় দিয়েছেন দাড়ি-মোছ, টুপি-পাগড়ী, পাজামা, মেসওয়াক, কুলুখ আর বিবি তালাকের মতো তুচ্ছ ফতওয়ার বিশ্লেষণে।

দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর হাদিসগুলি প্রধানত দুই রকমের। একটা ভাগ দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের ব্যাপারে, অন্যটি দাজ্জালের পরিচয়জ্ঞাপক। মানবজাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্ববৃহৎ বিপদের সম্বন্ধে মানুষ বেখেয়াল ও নিরুদ্বেগ। যারা ধর্মের ব্যাপারে মহা-আলেম হয়েছেন ও ধর্মচর্চার মধ্যে ডুবে আছেন তারাও সংকীর্ণ ও প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য দেখতে ও বুঝতে সক্ষম হন নি যে দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতি ধ্বংসকারী নুহের (আ.) মহাপ্লাবনের চেয়েও, প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও কেন বড় (আকবর) ঘটনা; কেন মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের (যদি সে ঘটনা সত্য হয়ে থাকে) চেয়েও সাংঘাতিক, যে যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী অর্থাৎ প্রায় এক কোটি আদম সন্তান নিহত হয়েছিল। অন্য ভাগের হাদিসগুলিতে আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতি যেন দাজ্জালকে ঠিকভাবে চিনতে পারে ও সাবধান হয়, দাজ্জালকে প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরোধিতা করে, সে জন্য তার পরিচিতির চিহ্নগুলি বলেছেন। কিন্তু তার সময়ের মানুষের শিক্ষার স্বল্পতার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে দাজ্জালকে রূপকভাবে বর্ণনা করতে হয়েছে। কিন্তু সে রূপক বর্ণনা আজ পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে, যদিও আমাদের প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য সে বর্ণনাও আমরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি না, দাজ্জালকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ও দাজ্জালের পায়ে সাজদায় পড়ে থেকেও বুঝতে পারছিনা যে এই সেই বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল, মাসীহ্ উল কায্‌যাব।

প্রথমেই দাজ্জালের নামটাকে নেয়া যাক। আল্লাহর রসুল একে দাজ্জাল নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটা কোনো নাম নয়, এটা একটা বর্ণনা, অর্থাৎ বিষয়টার বর্ণনা। যেমন এমাম মাহ্‌দী কোনো নাম নয়- বর্ণনা। মাহ্‌দী অর্থ হেদায়াহ প্রাপ্ত, যিনি সঠিক পথ, হেদায়াহ পেয়েছেন, তাঁর নিজের অন্য নাম থাকবে সবার মতো। তেমনি দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত। যেমন মাকাল ফল, দেখতে অতি সুন্দর, মনে হবে খেতেও অতি সুস্বাদু, কিন্তু আসলে খেতে বিস্বাদ, তিক্ত। 'দাজ্জাল' কোনো দৈত্য-দানব নয়, 'দাজ্জাল' ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা'।

পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ করে ফেলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবিচারে, দুঃখে, ক্রন্দনে, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত করেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন ছোট খাটো যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার বহুগুণ। বিধবা, সন্তানহারা, গৃহহারা, দেশত্যাগীদের কোনো হিসাব নেই। আর এই নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা করেছে দশ লক্ষ মানব। ইরাক ছাড়াও আফগানিস্তানসহ আরও অনেকগুলো দেশে তার এই হত্যাযজ্ঞ আজও চলছে। এই 'সভ্যতা'র অধীনস্থ সমস্ত পৃথিবীতে খুন, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, অত্যাচার সীমাহীন এবং প্রতিদিন প্রতি দেশে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে চলেছে। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময়, চোখ ধাঁধানো প্রতারক।

আল্লাহর রসুল কর্তৃক বর্ণিত আখেরী যামানার দাজ্জাল কোনো দৃশ্যমান *(Visible)* বা শরীরী *(Physical)* দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদের বোঝাবার জন্য এটি একটি রূপক *(Allegorical)* বর্ণনা। এর পরও যদি কেউ জোর করে বলতে চান যে, না, এক চক্ষুবিশিষ্ট, বিরাটকায়, জলজ্যান্ত একটি অশ্বারোহী দানবই আসবে, তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ধরুন আপনার কথামতো এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হলো, তার বাহন ঘোড়া বা গাধার দুই কানের ব্যবধানই সত্তর অর্থাৎ বহু সহস্র হাত [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে-বায়হাকী, মেশকাত], তাহলে কি কারো মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত সেই দাজ্জাল? **চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়তনের এক দানবকে দেখে প্রথমেই সকলের মনে প্রশ্ন আসবে, এই বিরাট দানব আসলো কোত্থেকে! তাকে দেখে কেবল মুসলিমরাই নয়, অ-মুসলিমরাও এক মুহূর্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো ইসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল। সকল মানুষেরই তখন আমাদের নবীর উপর এবং ইসলামের উপর ঈমান এসে যাবে।**

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রসুল বলেছেন, দাজ্জাল ইহুদি জাতি থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার (অসংখ্য) লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে [ইবনে হানবাল (রা.) থেকে মুসলিম]।

দাজ্জাল যদি রসুলের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যিই জ্যান্ত কোনো দানবীয় প্রাণী হয় তাহলে কি করে এমন দানব মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহুদি জাতির মধ্য থেকে আসতে পারে? আর মুসলিমরাই কী করে আল্লাহকে ছেড়ে একটি দানবকে অনুসরণ করতে পারে?

তৃতীয়ত, আল্লাহর রসুল বলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না [আবু হোরায়রা (রা.), আবু হোযায়ফা (রা.) এবং আনাস (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম]।

অর্থাৎ কিছু লোক (মো'মেন) দাজ্জালকে কাফের বলে বুঝতে পারবে আর কিছু লোক (যারা মো'মেন নয়) দাজ্জাল যে কাফের তা বুঝতে পারবে না, এবং বুঝতে পারবে না বলেই বহু সংখ্যক লোক তাকে রব বলে মেনে নেবে। দাজ্জাল যদি শরীরী কোনো দানবই হয় তাহলে সবাই তাকে প্রথম দর্শনেই দাজ্জাল বলে চেনার কথা। তারপরও সে কাফের কি কাফের নয় এ নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিমত হওয়া সম্ভব? ধরুণ কোনো লোকালয়ে বা জনবহুল স্থানে হঠাৎ একটি বাঘ এসে পড়ল; সেখানের অবস্থাটা কি হবে ভাবুন। ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারবে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করবে, তাই নয় কি? অথচ অকল্পনীয় বিরাট, ভয়ঙ্কর একটি দানব, যার বাহনের এক পা পৃথিবীর এক প্রান্তে আরেক পা পৃথিবীর অপর প্রান্তে, তাকে সামনা সামনি দেখেও কেউ চিনবে- কেউ চিনবে না, কেউ তাকে অনুসরণ করবে- কেউ করবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে- কেউ পারবে না এ কি হতে পারে?

তাহলে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে দাজ্জাল কোনো শরীরী বা বস্তুগত দানব নয়, এটি একটি বিরাট দানবীয় শক্তির রূপক বর্ণনা; সেই সাথে এ কথাতেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে ঐ বিরাট শক্তিটিই হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার পাশ্চাত্য ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক 'সভ্যতা'।

[সমস্ত পৃথিবীময় অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত ইত্যাদি নির্মূল করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদ নামক আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তাঁকে প্রকৃত ইসলামের যে জ্ঞান দান করেছেন তা তিনি যতটা সম্ভব হয়েছে বই-পুস্তক লিখে, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা করেছেন। এই লেখাটি মাননীয় এমামুয্যামানের লেখা "দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা!" বইটি থেকে সম্পাদিত। দাজ্জালের মতো এত ব্যাপক একটি বিষয় এইটুকু লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা কষ্টকর, তাই 'দাজ্জাল' সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে যামানার এমামের লেখা "দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা!" বইটি পড়ুন এবং এর উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রটি দেখুন।

জঙ্গিবাদী ও ইসলাম-বিদ্বেষীদের ভুলসমূহ

আমিরুল ইসলাম

বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকট জঙ্গিবাদ। জঙ্গিবাদের ইস্যুতে বিশ্বের বহু দেশে এই মুহূর্তে যুদ্ধ চলছে। আমাদের দেশেরও ৯০ শতাংশ মানুষ পরিচয়ে মুসলিম এবং সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত করে তুলতে ব্যাপক প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। জঙ্গিবাদের মোকাবেলায় সর্বত্র শক্তিপ্রয়োগের পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছে এবং যত বেশি শক্তিপ্রয়োগ করা হচ্ছে ততই জঙ্গিবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা বলছি, শক্তিপ্রয়োগ অপরাধ দমনের অন্যতম উপায়, তবে প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষা। এ কারণে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। সুশিক্ষা একটি জাতিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে তোলে যা চরিত্রের মধ্যে প্রোথিত হয়ে তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা মানবসভ্যতা অনাদিকাল থেকে পাপ, গোনাহ, অপরাধ ও আইনভঙ্গ থেকে ফিরিয়ে রেখে মানবতা, দেশপ্রেম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জঙ্গিবাদ কোনো সাধারণ অপরাধ নয়, এটি একটি আদর্শিক সন্ত্রাসবাদ যার প্রতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রগুলোর হাতে শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নেই; উপরন্তু যে ধর্ম মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার কথা সেই ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারাই মানুষ জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ সর্ষের মধ্যেই ভূত। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের পন্থা যে ফলপ্রসূ হচ্ছে না, এটা অনুভব করে এখন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ বলছেন, জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে, সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, জঙ্গিবাদের বিপরীতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত ও প্রণোদিত (Motivate) করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে কী বললে জঙ্গিরা তাদের পথ পরিত্যাগ করবে এবং নতুন করে কেউ আর জঙ্গি হবে না? এবং কীভাবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে?

যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য তার উৎপত্তি সম্পর্কে আগে জানতে হয়। এটা যদি একটা অসুখের মতো হয় এবং এর জন্য ডাক্তার দেখানো হয়, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রথম কাজ কি হবে? তিনি প্রথমে রোগীর লক্ষণগুলো দেখবেন যে এ রোগের ফলে রোগী কি ধরনের আচরণ করছে এবং এ আচরণের ফলে তার এবং তার আশেপাশের মানুষের কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। তারপরই তিনি ভাববেন এটার উৎপত্তির কারণ কি? উৎপত্তির কারণ না জেনে চিকিৎসা করলে ওষুধপত্র দিয়ে সাময়িকভাবে রোগের লক্ষণ (যেমন জ্বর) দূর করা গেলেও রোগ নির্মূল করা যাবে না, সেটা বার বার হবে। একইভাবে জঙ্গিদেরকে যদি জঙ্গিবাদ থেকে ফেরাতেই হয় তাহলে তা করতে হবে জঙ্গিবাদের উৎপত্তিস্থল থেকে। জঙ্গিবাদের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে? ধর্মের বিকৃত শিক্ষা থেকে। অতএব, জঙ্গিদেরকে ধর্ম থেকেই যুক্তি তুলে ধরে বোঝাতে হবে যে, এটা সঠিক পথ নয়। রোগের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিষেধক জরুরি। জঙ্গিবাদের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে কিন্তু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ইদানীং আল্লাহ-রসুলের সম্পর্কে কটূক্তিকারীদেরকে গোপনে ও প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। যারা রসুলাল্লাহকে নিজেদের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসেন, তাদের অনুভূতিকে অবজ্ঞা করার কোনো উপায় নাই, ঠিক একইভাবে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অভিলাসী বাম আদর্শকেও আমরা

অবজ্ঞা করতে পারি না। যে কোনো নিঃস্বার্থ আদর্শকে অস্বীকার করাই অনৈতিক, যদিও সব আদর্শ পরিণামে মানুষকে শান্তি দিতে সফল হয় না। যাহোক যারা এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি, তুমি যে রসুলকে গালাগালি করার কারণে তাকে মেরে ফেললে এটা কি রসুলাল্লাহর রেখে যাওয়া আদর্শ, পন্থা (সুন্নাহ্) মোতাবেক সঠিক হলো? যদি না হয়ে থাকে তাহলে তোমার এই কাজে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন না, রসুলাল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন না। আগে তোমাকে বুঝতে হবে এই কাজের ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহর নীতি কি? রসুলাল্লাহর ১৩ বছরের মক্কী জীবনে তাঁকে কী নির্যাতন, অপমান, অপদস্থই না করা হয়েছে, তিনি কি পারতেন না তাঁর অনুগত আসহাবদেরকে দিয়ে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গুপ্তহত্যা করাতে, জ্বালাও পোড়াও, ভাঙচুর করাতে? তিনি তা করেন নি। আমাদের দেশের একটি ধর্মান্ধ শ্রেণি প্রায়ই ইসলামবিদ্বেষীদের কর্মকাণ্ডে মূর্খের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে নিজ দেশের সম্পদ, রাস্তাঘাট ভাঙচুর করেন, নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেন। কিন্তু আল্লাহর রসুল তা করেন নি। তিনি অটল, অনড়, সংশপ্তক হয়ে সত্যের প্রচার ও প্রকাশ ঘটিয়ে গেছেন। একটা সময় তাঁর জীবনে এসেছে যখন ঐ বিরোধীরা নবীর প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করে তাঁরই অনুসারী হয়ে গেছেন। আর যারা বিরোধিতায় অটল ছিল তারা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। তাই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মতো নিষ্ফল প্রয়াস না করে কার্যকর পদক্ষেপ হলো জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা, জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে প্রাকৃতিক নিয়মেই বিজয় তাদেরকে অনুসরণ করবে। গত তেরশ বছর ধরে মুসলিম জাতিটির মধ্যে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা করে লক্ষ-কোটি মুসলিম দাবিদার মারা যাচ্ছে। আজও সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন, আরব, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা অব্যাহত আছে। গত ৫ বছরে সিরিয়াতে আড়াই লক্ষ মানুষ এই অন্তর্কোন্দলে নিহত হয়েছে। মসজিদে হামলা চালিয়ে এক মুসুল্লি আরেক মুসুল্লিকে হত্যা করছে। জাতির এই যখন অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন ইসলাম-বিদ্বেষী শ্রেণি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাতেই পারে। এই সুযোগ থাকবে না যদি এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। তাই রসুলের সুন্নাহ হচ্ছে সেটা করা। জঙ্গিদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমরা যে কাজ করছ তা দ্বারা তোমরা একূল ওকূল দু'টিই হারাচ্ছো। এতে তোমার সওয়াব হবে না বরং গুনাহ হবে। আর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর যে এজেন্ডা পশ্চিমা বিশ্ব নিয়েছে সেটা তাতে আরো বৃদ্ধি পাবে। তাদের কাছে আছে বিরাট বিশাল সামরিক শক্তি, এবং আছে প্রভূত পার্থিব সম্পদ। পক্ষান্তরে এই ক্ষুদ্রসংখ্যক জঙ্গিদের কাছে ওসব কিছুই নেই, তাদের পার্থিব সম্পদ, তেল গ্যাস ইত্যাদিও তাদের হাতে নেই, সেগুলো তাদের সরকারগুলোর হাতে, যারা ইতোমধ্যেই পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর পায়ে সাজদায় প্রণত হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্যত অস্বীকার করে পশ্চিমা শক্তি ও জীবনদর্শনকেই প্রভু ও বিধাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং মরিয়া হয়ে তারা ভুল কাজ করছেন। তারা এখানে ওখানে বোমা ফাটাচ্ছেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করছেন। তাতে পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর কোন ক্ষতি না হওয়ায় তারা শরীরে বোমা বেঁধে আত্মঘাতি হচ্ছেন। এতে প্রতিপক্ষের কী ক্ষতি হয়েছে? ধরতে গেলে কিছুই না। টুইন টাওয়ার গেছে তাতে কী হয়েছে? এখন ঐ স্থানেই সেই টুইন টাওয়ারের চেয়েও বড় টাওয়ার তৈরি করেছে। বরং এতে প্রতিপক্ষের লাভই হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষকে সে বলছে যে– দেখ! এরা কী রকম সন্ত্রাসী। এরা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ, স্ত্রীলোক, শিশু হত্যা করছে। এদের ধর, মার, জেলে দাও, ফাঁসি দাও। পৃথিবী তার এ কথা মেনে নিয়েছে এবং তার নির্দেশ মোতাবেক তা-ই করছে, কারণ ইংরাজি প্রবাদ বাক্য Might is right অর্থাৎ মহাশক্তিধরের কথাই ঠিক।

এই কথাগুলো জঙ্গিবাদীদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের এই কাজের দ্বারাই তোমাদের প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। সেই ঐক্যের সামনে তোমরা দাঁড়াতেই পারবে না। যেমনটা হয়েছে শার্লি হেবদোর ঘটনায়। যে পত্রিকা কেউ চিনত না, সেটার নাম এখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মুখে মুখে। সুতরাং এই ভুল পন্থা ছাড়ো। এই ব্যাপারটি বোঝানোর পরের কাজ দুইটি।

প্রথমত, যারা ইতোমধ্যেই জঙ্গি হয়ে গেছে তারা নৈতিক বল হারিয়ে ফেলবে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আর একাজে যাবে না। তারা সবাই হুট করেই পূর্ণভাবে নিবৃত হয়ে যাবে এটা আমরা

জঙ্গিবাদ কোনো সাধারণ অপরাধ নয়, এটি একটি আদর্শিক সন্ত্রাসবাদ যার প্রতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রগুলোর হাতে শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নেই; উপরন্তু যে ধর্ম মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার কথা সেই ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারাই মানুষ জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। কাজেই এটি নির্মূল করতে হলে তাদের সামনে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তথা সঠিক ও নির্ভুল আদর্শ তুলে ধরতে হবে।

বলছি না। কিন্তু তারা অধিকাংশই নিজেদের কাজ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে যাবে। তারা একটা মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হবে। এই দ্বিধাই তাদেরকে বেপরোয়া হতে বাধা দেবে।

দ্বিতীয়ত, আরেকটা ভাগ রয়ে যাবে যারা তারপরও ওই ধরনের কর্মকাণ্ড করতেই থাকবে। কিন্তু তখন তাদের সংখ্যা হবে কম। তখন তাদেরকে নিবৃত্ত করতে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োজন পড়বে। জনগণ প্রকৃত শিক্ষা পেলে স্বভাবতই সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠবে, তারা সরকারকে জঙ্গিদমনে সহযোগিতা করবে, জঙ্গিদের রিক্রুটমেন্টও বন্ধ হবে। জঙ্গিদের সংখ্যা কম থাকলে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগে তা নির্মূল করা সম্ভব হবে। এই শিক্ষা দিতে হবে সর্বতোভাবে, উভয়প্রকার শিক্ষাব্যবস্থায় এবং গণমাধ্যমের দ্বারা। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটি শিক্ষাকে আমরা উদাহরণ হিসাবে দিলাম, এমন বহু বিষয় আছে যা জঙ্গিবাদ ও এর উৎপত্তির প্রতিটি পথ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হবে এটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

কিন্তু এখন যদি রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে উগ্রপন্থী ইসলামিস্টদের দমন করতে চায় তাহলে জনসাধারণের ধর্মানুভূতি, ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। কারণ তাদের আছে ধর্মনেতার ভাবমূর্তি। তারা সাধারণ জনগণকে বলবে দেখ আমরা রসুলের জন্য এতোকিছু করছি অথচ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। অতএব সরকার ইসলামবিরোধী, নাস্তিক, তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার ফতোয়াও তারা দিয়ে দিতে পারে। আমাদের দেশে অতীতে এটা বহুবার হয়েছে। প্রতিবারই জনগণ তাদের কথায় প্রভাবিত হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনার পথ রুদ্ধ নয়

ইসলামপ্রিয় মানুষদেরকে আজ বুঝতে হবে, ইসলাম একটি আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Ideology ev complete code of life)। কাজেই অন্য কোনো আদর্শের অনুসারীরা এর সমালোচনা করতেই পারেন, তাদের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি তুলে ধরতে পারেন। আল্লাহ নিজেই তাঁর সৃষ্টির এবং কোর'আনের অসঙ্গতি খুঁজে বের করার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, তুমি করুণাময় আল্লাহ

তা'আলার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোন ভুল দেখতে পাও কি? অতপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। [সুরা মুলক আয়াতঃ ৩-৪] এখানে আল্লাহ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাফওয়াতিন যার অর্থ Falt, Flaw, অসামঞ্জস্য, বৈপরিত্য, ভুল এবং ফুতুরিন যার অর্থ খুঁত, ফাটল, চিড়, ভাঙ্গন, ত্রুটি, অসঙ্গতি ইত্যাদি (আরবি-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০, ইফাবা)। কাজেই আল্লাহ স্বয়ং যেখানে তাঁর কোর'আন সম্পর্কে, সৃষ্টি সম্পর্কে, আয়াত এমন কি তাঁর নিজের সম্পর্কে ভুল সন্ধান করার জন্য আহ্বান করছেন, সেখানে কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা করে, তার দৃষ্টিতে ধরা পড়া কোনো অসঙ্গতি তুলে ধরে তাহলে তার বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রদর্শন করা, তাকে আক্রমণ করা, তাকে হত্যা করা ইত্যাদি অবশ্যই অন্যায্য, অপ্রগতিশীল, ক্ষুদ্রতা, অযৌক্তিক, আল্লাহর অভিপ্রায় বহির্ভূত কাজ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যেটা করণীয় তা হচ্ছে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেদের মতামতকে সমুন্নত করা এবং মিথ্যা অভিযোগ ব্যর্থ প্রমাণ করা। এ কাজটিই আল্লাহ করেছেন তাঁর সমগ্র কোর'আনময়।

অন্যদিকে যারা কূপমণ্ডূক ধর্মব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ-রসুল, ধর্মগ্রন্থসমূহ, অবতারগণ এবং তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, ব্যাঙ্গচিত্র এঁকে, অশ্লীল সাহিত্য লিখছেন তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো, সমালোচনা এক জিনিস আর গালিগালাজ আরেক জিনিস। কুৎসিত ধর্মবিদ্বেষী আচার আচরণ করে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে আঘাত করে দেশে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কোনোভাবেই বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তমনের পরিচায়ক নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি উপস্থাপন করে গঠনমূলক যৌক্তিক সমালোচনা করুন, আমরা এর যথাযথ জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি আছি।

তবে আজ থেকে ১৪শ' বছর আগের শিক্ষা-দীক্ষাহীন, সামরিক শক্তিহীন, ঐক্যহীন, শৃঙ্খলাহীন, লক্ষ্যহীন, সর্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ, দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, বংশানুক্রমে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত, এক কথায় আরব গোত্রভিত্তিক অসভ্য বেদুইন জনগোষ্ঠীকে যিনি একটি অর্ধবিশ্বজয়ী, সুসংগঠিত, দুর্দান্ত গতিশীল, সুশৃঙ্খল, চারিত্রিক ও পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ, ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ ও সুসভ্য একটি জাতিতে রূপান্তরিত করলেন, যাঁর মাধ্যমে ঐ জাতিটি অতি অল্প সময়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিশ্বের সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হলো, যিনি মানব ইতিহাসের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন, তাঁর এত বিরাট কৃতিত্ব যারা দেখে না, সেই মহাবিপ্লবী নবীর জীবনীতে মানুষ হিসাবে তাঁর সার্বিক সফলতার মহত্তম রূপ যাদের দৃষ্টিতে পড়ে না, বরং সেই মানুষটির ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যারা দিনরাত বিষোদগার করে বেড়ান, এমন স্থূলমস্তিষ্ক, দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারে কী-ই বা বলার আছে? এই ক্ষুদ্রতা শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে কীভাবে এলো সেটা ধর্মপ্রিয় মানুষেরা যদি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতেন তাহলে আর এই দৃষ্টিহীনদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে কীভাবে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে যত্নশীল হতেন।

আদর্শিক লড়াইয়ের উপাদান আছে হেযবুত তওহীদের কাছে

চলমান সংকটসমূহ মোকাবেলায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জনগণের সামনে এনে ধর্মব্যবসায়ীদের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ধর্মের এই প্রকৃত শিক্ষা কোনো স্কুলেও নাই, মাদ্রাসায়ও নাই, আছে একমাত্র হেযবুত তওহীদের কাছে- এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি এবং আমাদের সাধ্যমত সেটা আমরা সরকার, গণমাধ্যমসহ সর্বশ্রেণির মানুষের সামনে তুলে ধরছি। এ কাজে কোনো রাজনীতিক বা আর্থিক স্বার্থও আমাদের নেই। আমরা এমনকি এটাও চাই না যে, এই শিক্ষাকে জনকল্যাণে প্রচার করা হলে সেখানে হেযবুত তওহীদের নাম প্রচার করতে হবে বা যাঁর মাধ্যমে আমরা এই সত্য পেয়েছি, সেই মাননীয় এমামুয্যামানের নাম প্রচার করতে হবে। আমাদেরকে কোনো স্বীকৃতিও দেওয়ার দরকার নেই। তবু দেশের স্বার্থে এই সত্য শিক্ষাটি তুলে ধরা প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য, যার যেখানে সম্ভব হয়। কেউ চাইলে তা নিজের নামেও যদি তা প্রচার করেন আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলন ও মতবিনিময় সভায় হেযবুত তওহীদের উদ্দেশে করা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন: আপনারা কি বাংলাদেশের সংবিধানকে স্বীকার করেন?

উত্তর: বাংলাদেশে গত কুড়ি বছর থেকে সংবিধান মেনেই আমরা কাজ করছি এবং আমরাই বলতে পারি যদি কেউ এদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংবিধানের নিয়মগুলো রক্ষা করে চলে তবে সেটা এই হেযবুত তওহীদ। কারণ গত কুড়ি বছর ধরে সংবিধান পরিপন্থী কোনো কাজ করেছি বলে কোনো নজির কেউ দেখাতে পারবে না। বরং সংবিধানপ্রদত্ত যে নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার তা আমাদের বেলায় অন্যদের দ্বারা বার বার লংঘিত হয়েছে। আমাদের কথা বলতে দেয়া হয় নি, আমাদের মিটিং করতে দেয়া হয় নি, আমাদের অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে মর্যাদাহানি করা হয়েছে, অনর্থক সন্দেহ করে প্রশাসনিক ও সামাজিক হয়রানি করা হয়েছে, ৪৬০ এরও অধিক বার মিথ্যা অভিযোগে জেলে দেয়া হয়েছে যে মিথ্যা আদালতে আর প্রশাসনের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের বাড়ি-ঘরে হামলা করা হয়েছে, আমাদের লেখা সম্পূর্ণ বৈধ হ্যান্ডবিল ও বই প্রচার করতে দেওয়া হয় নি। এগুলো গত কুড়ি বছরে হাজার হাজার বার হয়েছে, যার ডকুমেন্ট আমরা সংরক্ষণ করেছি, কেউ দেখতে চাইলে দেখবেন। অথচ আমাদের বইপত্র ও সিডি সব প্রকাশনা সামগ্রীই সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়মকানুন অনুসরণ করেই ছাপানো হয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, সংবিধানের নীতি পরিপন্থী কাজ আমাদের সঙ্গে করা হয়েছে, কিন্তু আমরা করি নি। আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও আমরা আইন ভঙ্গ করি নি, আইনকে নিজের হাতে তুলে নেই নি।

আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, আমরা সংবিধান মানি কি না? আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে সংবিধানের মূলনীতিগুলো অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ এগুলো আমরা স্বীকার করি কিনা?

এ বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হলো, প্রথমত আমরা গণতন্ত্র মানি কি না। আসলে এক কথায় এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। কারণ কেতাবে যাই লেখা থাক বাস্তবে গণতন্ত্রের যে করাল রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুনিয়াময়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়, গণতন্ত্রের নামে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়, কথায় কথায় হরতাল ডাকা হয়, নাস্তানাবুদ করা হয়, সহিংস কর্মকাণ্ড চালানো হয়, কারখানায় লক আউট করা হয়, এভাবে গণতন্ত্রের নামে সমস্ত অপকর্মগুলো যে চলে। যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো মাপকাঠি নেই, জনতার নামে সব চালিয়ে দেওয়া হয় আমরা এ গণতন্ত্র মানি না। শুধু তা-ই না, আমরা মনে করি, কোনো সভ্য মানুষ এই

জাতীয় গণতন্ত্র মানতে পারে না এবং এ জাতীয় গণতন্ত্র দিয়ে কোনো দেশ সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নতি করতে পারে না। যে গণতন্ত্রের কারণে গত ৪৪ বছরে জাতিটি একদিনের জন্যও স্বস্তি পায় নি, যার দ্বারা জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, হানাহানি হয়, একটা জাতি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, নিজের দলের লোকেরা পদের জন্য নিজেদের হত্যা করে, আমরা এমন সর্বনাশা গণতন্ত্রকে ঘৃণা করি, প্রত্যাখ্যান করি। এ জাতীয় গণতন্ত্র দিয়ে পুরো দেশ, জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে পশ্চিমাদের চাপিয়ে যাওয়া ষড়যন্ত্রমূলক ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি। আশা করি এ সহিংস জাতিবিনাশী গণতন্ত্রের কথা আমাদের সংবিধানে লেখা নেই। সেখানে যে গণতন্ত্রের কথা লেখা আছে তা হলো, ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা, অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সকলের বাক স্বাধীনতা, গবেষণার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা, অবাধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন দিয়ে সরকার গঠনের স্বাধীনতা, সরকারকে পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন নাগরিক হিসাবে যে কারো মতামত প্রদানের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই যদি গণতন্ত্র হয়ে থাকে তবে আমি এই সব নীতেকে স্যালুট করি, আমরা এই সকল অধিকার চাই, এর জন্য লড়াই করি। আল্লাহর রসুলের প্রকৃত ইসলামও মানুষের এ অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেয় এবং তা প্রাপ্তির সঠিক পথ দেখায়।

এরপরে ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার মানে যে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন, যার যার ধর্ম সে সম্মানের সঙ্গে পালন করবে, তার বিশ্বাসে কেউ আঘাত করবে না, তার উপাসনালয়ে কেউ হামলা করবে না, অর্থাৎ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা, ধর্মীয় আনন্দ-অনুষ্ঠান করার স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সকল ধর্মের মানুষ তাদের যোগ্যতা অনুসারে সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে, এক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় প্রাধান্য পাবে না। এটা ধর্মনিরপেক্ষতা যদি হয়ে থাকে তবে ধর্মনিরপেক্ষতার এই নীতিকে আমরা সম্মান করি। ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন সব ধর্মের লোকেরাই সেই ভূখণ্ডে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করেছিল। আমরা প্রকৃত ইসলামের যুগ বলতে রসুলাল্লাহর পর থেকে ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত সময়কালকে বুঝি। এর পরে ইসলাম শাসক ও ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সেটার উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছিল ভোগবিলাস ও সাম্রাজ্যবাদ। তারপর থেকে ইসলামের নামে যা কিছু করা হয়েছে তার সঙ্গে আল্লাহ-রসুলের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এর জন্য উম্মতে মোহাম্মদীকে দোষারোপ করা অযৌক্তিক।

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম কীভাবে সেটাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন। বাইবেলে রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থা নেই, তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তির পথনির্দেশ করতে খ্রিষ্টধর্ম ব্যর্থ হয়। এজন্য ইউরোপে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে মানুষের তৈরি বিধান দিয়েই রাষ্ট্র চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ইউরোপ রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা একটা বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দিয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা, মিডিয়ার মাধ্যমে অপ-প্রচার চালিয়ে সেই ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকেও ধর্মকে উৎখাত করে দিতে চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষতার নাম নিয়ে প্রকারান্তরে ধর্মহীনতার চর্চা শুরু হয়, এটাকে যদি ধর্মনিরপেক্ষতা বলেন তবে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেই ধর্মহীনতা আমরা মানি না। কারণ এতে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মনিরপেক্ষতা যিগির তুলে আল্লাহর দেওয়া বিধানের প্রাকৃতিক ও মহাসত্য বিষয়গুলোকেও ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে জীবনকে অপ্রাকৃতিক করে তোলা হয়। মানুষের ঈমানকে বনসাই বানিয়ে রাখার এ প্রচেষ্টার ফলেই মানুষ ক্ষুব্ধ হয় আর ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে ধর্মকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগায়। ধর্মকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রেরণা থেকেই জন্ম নিয়েছে ধর্মভিত্তিক অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদ। এগুলোর দ্বারা মানুষ ইহজীবনও হারিয়েছে, পরকালও হারিয়েছে। ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ বা ধর্মপ্রাণ মানুষের চিন্তা চেতনাকে হেয় করার ফলে মানবতা, জাতি, রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ নৈতিকতা হারিয়ে অপরাধী হয়েছে। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতা যদি ধর্মহীনতা হয়, তবে আমরা এই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নই। আমাদের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যার যার ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার নিশ্চিত করা, আমরা দৃঢ়ভাবেই এর সমর্থন করি।

এরপরে জাতীয়তাবাদ। এমামুয্যামান বলেছেন, জাতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি জাতির এককমাত্র, কিন্তু জাতির বাইরে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই। ইসলাম অর্থ শান্তি, আর শান্তি একটি সমষ্টিক বিষয়।

এককভাবে একজনের জীবনকে শান্তিময় করা সম্ভব নয়, যদি আরেকজন অশান্তি সৃষ্টি করে। ইসলামের সবকিছুই হলো জাতি ভিত্তিক। আমি প্রথমে বলব মানবজাতি এক জাতি। বাবা আদম (আ.), মা হাওয়ার সন্তান সমস্ত পৃথিবীর সবাই আমরা একজাতি, মানবজাতি। অন্যদিকে আমরা বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষও একজাতি। আমরা বাঙালি জাতি। কিন্তু নামে একজাতি হলেই হবে না, প্রত্যেকের অনুভূতি, জাত্যবোধ, চিন্তা চেতনা এক হতে হবে। আমরা একে অন্যের সমস্যাগুলো ভাগাভাগি করে নেব, প্রত্যেকের বিপদে এগিয়ে যাব। একজন বিপদগ্রস্তকে দেখে পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাব না, তাকে রক্ষার চেষ্টা করব, জাতির সঙ্কটে সম্মিলিতভাবে ভূমিকা রাখব, জাতির ক্ষতি হয় এমন কাজ কেউ তো করবই না বরং অন্য কেউ করলে তা সবাই মিলে প্রতিহত করব। এটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। তা না করে কেবল রাজনীতির মঞ্চে গলার রগ ফুলিয়ে আমি বাঙালি, আমি মুসলমান ইত্যাদি বলে চিৎকার করে লাভ নেই। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমরা ষোল কোটি যদি সত্যিই এক জাতিভুক্ত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো বিভক্তি থাকবে না। আমাদের ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে যদি সমাজের স্বার্থকে স্থান না দেই, তবে আমাদের দিয়ে কোনোদিন জাতিগঠন হবে না। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে আমরা সর্বদা একমত থাকব, আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব সমস্ত ধর্মব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে, অন্যায়, অসত্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে। আমরা শক্তিশালী জাতি গঠনের পক্ষে। পাশ্চাত্য জাতিগুলিও তাদের ভৌগোলিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী, এবং ঐ ভৌগোলিক রাষ্ট্রের স্বার্থকে তাদের অধিকাংশ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর স্থান দেয়। নিজের লাভ হবে কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে এমন কাজ তাদের অধিকাংশ লোকেই করবে না। তাদের বিদ্যালয়, স্কুল-কলেজে, ছোট বেলা থেকেই কতকগুলি বুনিয়াদী শিক্ষা এমনভাবে তাদের চরিত্রের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয় যে, তা থেকে কিছু সংখ্যক অপরাধী চরিত্রের লোক ছাড়া কেউ মুক্ত হতে পারে না। ফলে দেখা যায় যে ওসব দেশের মদখোর, মাতাল, ব্যভিচারীকে দিয়েও তার দেশের, জাতির ক্ষতি হবে এমন কাজ করানো যায় না, খাওয়ার জিনিসে ভেজাল দেওয়ানো যায় না, মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন জিনিষ বিক্রি করানো যায় না ইত্যাদি। অথচ আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান আছে কিন্তু সেই শ্লোগান দিয়ে জাতির সম্পদই ধ্বংস করা হচ্ছে। ষোল কোটি বাঙালিকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জাতি সত্তা গড়ার কাজ আমরা করে যাচ্ছি। গত ৪৪ বছরে এই কাজ কেউ করে নি, সবাই ভাঙার চেষ্টা করেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করাকেই রাজনীতি মনে করা হচ্ছে। এটা কি জাতীয়তাবাদ হলো? প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, রাজনীতিক মতবাদ চাপিয়ে দিয়ে রাজনীতিক দল সৃষ্টি করে হানাহানির ইতিহাস দেখেছি আমরা গত ৪৪ বছরে। আমাদের সংবিধানে শক্তিশালী জাতিসত্তার যে ধারণা আছে আমরা মনে করি সেটা পূরণ করতে পারছে হেযবুত তওহীদ। আমরা বিগত ২০ বছরে বহু নির্যাতিত হয়েছি, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছি। ভাঙচুরের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না, ওপথে কোনোদিন মানুষের শান্তি আসতে পারে না। জাতির কৃষক-শ্রমিক, হাড্ডি-কঙ্কালসার জনগণের রক্ত শোষণ করে নিয়ে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি করছেন, বিদেশে বিলাসী জীবন-যাপনের জন্য অর্থ পাচার করছেন- এরা জাতির শত্রু, এদের দ্বারা কখনো শক্তিশালী জাতি গঠন হবে না।

তবে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধারণায় আমরা বিশ্বাসী নই, কারণ এটাও এক প্রকার অন্ধ অমানবিকতার জন্ম দেয়। আমি বাঙালি জাতি নিয়ে খুব সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে আছি, অথচ পার্শ্ববর্তী দেশে একটি জনগোষ্ঠী না খেয়ে মরছে আমি তার দিকে চেয়ে দেখব না এটা ঠিক নয়। আমাদের দেশেই ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ যদি চরম দুর্ভোগের মধ্যে বাস করে, প্রতিনিয়ত সেখানে মানবতা পদদলিত হয় সেটা আমারও কষ্টের কারণ হতে হবে। এটা যদি না হয় তবে তা মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো না, কাল আমাকেও হয়তো বিপদে পড়তে হবে, তখন আমার পাশেও কেউ দাঁড়াবে না। কাজেই ন্যায়-নীতিভিত্তিক, শক্তিশালী জাতিসত্তা গঠনে আমরা অগ্রগামী থাকতে চাই।

শেষ কথা হলো: আমাদেরকে যখন বলা হয় আপনারা সংবিধান মানেন কি না তখন আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে- সংবিধান পরিপন্থী কোনো কাজ অন্তত আমাদের দ্বারা হয় নাই।

প্রশ্ন: আপনারা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোর'আনের শাসন চান কি না?

উত্তর: কোর'আনের শাসন চাওয়া ও না চাওয়ার বিষয়টি বর্তমান যুগের সবচেয়ে আলোচিত, বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন ইসলামের কথা বললে শুরুতেই চলে আসে কোর'আনী শাসনের কথা। তাই হেযবুত তওহীদ যখন প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরছে তখন এ প্রশ্নটির উত্থাপন খুবই প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসংগত। কোর'আন চাই কি চাই না এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয় কারণ বিষয়টি নিয়ে আমদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি আর বর্তমান প্রচলিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক কথায় এর উত্তর দিলে তা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে এবং শ্রোতা ভুল বার্তা পাবেন।

প্রথমে আমাদেরকে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা মাথায় রাখতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে কোর'আন কী? আজকে গ্রন্থাকারে যে কেতাবটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে বিভিন্ন বিধি বিধান সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা হঠাৎ করে আল্লাহর রসুল পান নি, এটি ২৩ বছরে একটি সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন সঙ্কট, বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে নাযেল হওয়া আল্লাহর বিধি বিধানের সমষ্টি। এই কোর'আন হুট করে নাযিল হয় নি, রসুলাল্লাহও হুট করে এটি প্রতিষ্ঠা করে শরিয়াহগুলো প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন নি। আমাদের দেশের সংবিধান আজকে যে অবস্থায় এসেছে সেটা কি একদিনে এসেছে? বহু ঘটনার প্রেক্ষিতে, জাতির প্রয়োজনে সংবিধানে নতুন নতুন বিধান সংযুক্ত হয়েছে। কোর'আনটাও এভাবেই ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়েছে এবং ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, একে বলা হয় তওহীদ। আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অধিকাংশ লোকেরাই তওহীদ কী জানে না। কলেমা তো শুধু মুখস্থ বললেই হবে না, যিকির করলেই হবে না। এর মানে কী, তাৎপর্য কী, দাবি কী জানতে হবে। এটি আসলে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার একটি চুক্তি যে চুক্তির উপর মানবজাতির পার্থিব জীবনের শান্তি-অশান্তি এবং পারলৌকিক জীবনের জান্নাত-জাহান্নাম নির্ভর করছে। কীভাবে? সর্বপ্রথম মানুষকে বুঝতে হবে যে, স্রষ্টার বিধান সর্বোত্তম, তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না যে কীসে মানবজাতি শান্তিতে থাকবে। এটা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বোঝার পর তাদেরকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, তাহলে আমরা আল্লাহর বিধান যে বিষয়ে আছে সে বিষয়ে নিজেরা বিধান তৈরি করব না, আল্লাহরটাই মানব। আল্লাহরটা মানার মানসিকতা আসলে তখন মানুষ দেখবে যে আল্লাহ কী বিধান দিচ্ছেন। আজ কলেমার মানে করা হয়, একমাত্র আল্লাহকেই সেজদা করতে হবে, ডাকতে হবে, তাঁরই জন্য নামাজ-রোযা করতে হবে ইত্যাদি। কলেমার এই ভুল ব্যাখ্যা মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এ জাতির মনে মগজে গেড়ে গেছে। এই বিকৃত ইসলামে যার গুরুত্ব এক নম্বর সেটাকে একশত নম্বরে রাখা হয়েছে আর যেটার গুরুত্ব একশত নম্বর সেটাকে বানানো হয়েছে এক নম্বর। মানবদেহে নখের গুরুত্ব আর হৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব কি সমান? ইসলামের উদ্দেশ্য শান্তি, কিন্তু দাড়ির সঙ্গে সমাজের শান্তি-নিরাপত্তার কী কোনো সম্পর্ক আছে? অথচ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই আগে দাড়ি প্রতিষ্ঠ, টুপি প্রতিষ্ঠা, জোব্বা আর বোরখা প্রতিষ্ঠা। ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই চোর-ডাকাত ধরে হাত পা কেটে দেওয়া। জেহাদ মানেই যেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ভিন্ন সম্প্রদায়ে উপাসনালয়ে, সিনেমা হলে, আদালতে চোরাগোপ্তা বোমা মারা। ইসলাম সম্পর্কে যে সমাজে এমন কু-ধারণা, সেখানে কোর'আনের শাসন আরোপ করলেও শান্তি আসবে না। প্রতিটি কাজের একটি ধারাবাহিকতা আছে, এ ধারাবাহিকতাও একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম না মেনে যদি গায়ের জোরে একটি দণ্ডবিধি, জীবনব্যবস্থা কোনো জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে অসন্তোষ আরো বাড়বে। কারণ এ সমাজে ধর্মব্যবসায়ীদের দীর্ঘ অপপ্রচারের ফলে ইসলামের প্রকৃত ধারণাটাই বিকৃত হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার দ্বারা তাদের মন-মগজ আমূল বিবর্তিত ও প্রভাবিত। ফলে এ সমাজের মানুষগুলো ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড জানে না, জানলেও পরোয়া করে না, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য কী, ধর্ম কী, মানবজাতির প্রকৃত এবাদত কী তা বোঝে না, তারা লেবাসকেই মনে করে ধর্ম। আমি শুধু স্বল্পশিক্ষিত শ্রেণির কথা

বলছি না, গোটা জনগোষ্ঠী যারা ইসলামপ্রিয় এবং ইসলামবিদ্বেষী সবাই ধর্ম বলতে এসব আনুষ্ঠানিকতা, লেবাস, বোরখা, অভ্যাস অনভ্যাস এবং কোর'আনের কয়েকটি আইন-কানুনকেই বোঝেন। ধর্মব্যবসায়ীদের অর্থ দেওয়াকেই মুসল্লিরা সওয়াবের কাজ মনে করে। ধর্মব্যবসা অর্থাৎ নামাজ পড়ানো থেকে শুরু করে ধর্মের যে কোনো কাজ করে টাকা নেওয়া যে আল্লাহ হারাম করেছেন এটা সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জানেনই না। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলতেই তারা বোঝেন যে ইসলামটা মোল্লাদের হাতে আছে সেটাই ক্ষমতাসীন হওয়া অর্থাৎ থিয়োক্রেসি বা মোল্লাতন্ত্র কায়েম হওয়া। এটাকে কোনোভাবেই শিক্ষিত, যুক্তিশীল, সভ্য মানুষ মেনে নিতে পারে না, এটাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠাও বলা যায় না।

আজ তারা এবাদত বলতে বোঝে মসজিদ আর খানকায় গিয়ে পড়ে থাকা, যিকির করা। এটা করে কি দেশে শান্তি আসবে না এসেছে কোনো কালে? আগে ধর্মবিশ্বাসীদেরকে বোঝাতে হবে যে এবাদত হচ্ছে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা যে সমাজে মানুষ নিরাপদে থাকবে, পিকেটারের ইট খেয়ে হাসপাতালে যেতে হবে না, সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে, কোনো নারী ধর্ষিত হবে না, কষ্টের উপার্জন ঘুষখোর বা ছিনতাইকারীর পকেটে যাবে না, বেকারত্বের গ্লানি নিয়ে কেউ আত্মহত্যা করবে না, কেউ যেন ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না, কেউ বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরবে না। এমন সমাজ তৈরি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাই জেহাদ, এটাই বড় এবাদত।

বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই পশ্চিমা বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাকে জাতীয় জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে তা পালন করে চলছে। আমরা মনে করি, এটা এমন একটি সিস্টেম যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা আমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে দাসে পরিণত করার জন্য চাপিয়ে দিয়ে গেছে। সুতরাং এ সমাজের মানুষকে হুট করে কোর'আনের শাসনের কথা বলা অবান্তর ও অযৌক্তিক হবে। এজন্য আল্লাহর রসুলও তা বলেন নি। আপনি যদি রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চান, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে রসুলাল্লাহ যেভাবে শুরু করেছিলেন আপনাকেও সেভাবেই শুরু করতে হবে, রসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। কারণ তিনি হচ্ছেন উত্তম আদর্শ, উসওয়াতুল হাসানা। তিনি দাড়ি রেখেছেন বিধায় আপনিও ঐভাবে দাড়ি রাখবেন এই জন্য নয়, দাড়ি সব মানুষেরই হয়। তাই একটি নির্দিষ্ট স্টাইলের দাড়ি রাখানোর, নির্দিষ্ট পোশাক পরানোর জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন এমন ধারণা মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি দাড়ি রাখার আদর্শ নিয়ে আসেন নি, তিনি এসেছেন মানবজীবন থেকে সকল অন্যায় দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। পবিত্র কোর'আনে অন্তত তিনটি স্থানে আল্লাহ মহানবীর আগমনের উদ্দেশ্য এবং কাজ কী তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহ সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্য জীবনব্যবস্থাসহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন এই জন্য যে রসুল যেন একে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি প্রথমে কী করলেন? প্রথমে তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান জানালেন। মক্কার লোকেদের কলেমা বোঝালেন, তওহীদ বোঝালেন। মক্কার লোকেরা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পক্ষে ছিল না। তিনি প্রথমে তাদের আল্লাহর বিধান কেন মানতে হবে তা বোঝালেন, ঐক্য বোঝালেন, একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন। তখন তারা ধীরে ধীরে কলেমা বুঝতে পারল তখন রসুলাল্লাহকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হলো। বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করল তাঁকে কেন্দ্র করে। মক্কায় যে তের বছর ছিলেন এ দীর্ঘ সময়ে সেখানে তাঁর অনেক আনুগত্যশীল অনুসারী তৈরি হয়েছিলেন, তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলে একটি সহিংস অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাঁর প্রধান বিরোধীদেরকে হত্যা করে তাঁর আদর্শকে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, কারণ অধিকাংশ লোকের মনের বিরুদ্ধে গিয়ে শাসনক্ষমতা নিলেও নিরাপদ সমাজ গঠন করা যায় না। একবার মক্কার শাসন ক্ষমতা তাঁকে দেওয়ার প্রস্তাবও তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেটাও প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি দেখেছেন তিনি যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করতে চান তখনও জনগণ সেটা

বোঝে নি, তারা তাদের পূর্ববর্তী জীবনবিধান বা ধারণা নিয়েই থাকতে চেয়েছে। তাই রসুল অপেক্ষা করেছেন তাঁর আদর্শটা জনগণের কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য। এভাবে অপেক্ষা করে ১৩ বছর শুধু তওহীদের আহ্বান করে গেছেন। মক্কাবাসীকে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে তোমরা সমস্ত ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহকে মেনে নাও। এটাই সমস্ত জীবনের মঙ্গল। কিন্তু গুটিকয় লোক বাদে সবাই প্রত্যাখ্যান করল। এরই মধ্যে মদিনাবাসীদের মধ্যে একটি বড় অংশ তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলো এবং তাঁকে নিজেদের পরিবারের মতো করে আশ্রয় দিতে সম্মত হলো। তিনি মদিনায় চলে গেলেন, কারণ সত্য প্রতিষ্ঠাই তাঁর মিশন। যারা সত্য গ্রহণে আগ্রহী তাদের কাছেই তিনি যাবেন। তখন মদিনাকেন্দ্রীক একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থা কায়েম হলো। সেই ঐক্যবদ্ধ সমাজ নেতা হিসাবে রসুলাল্লাহকে মেনে নিলেন, তারা তাদের যাবতীয় সমস্যার সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে রসুলকে মেনে নিলেন। সেখানে বসবাসকারী সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে নিয়ে তিনি একটি ঐক্য ও নিরাপত্তাচুক্তি করলেন। যখন একটি জাতি রসুলাল্লাহকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হলো তারপর থেকে তাদের যাবতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ একটার পর একটা বিধান নাজেল করতে থাকেন। এ বিধানগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে আজকের কোর'আন। এখন আমাদের এ দেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনি যদি শ্লোগান তোলেন যে আল্লাহর আইন চাই, শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন কমিটি করেন তাহলে এসব কথা হবে লোকভুলানো কথা, প্রতারণামূলক রাজনৈতিক শ্লোগান। কারণ আমাদের দেশের জনগণ ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য বোঝে না, তারা বিকৃত ইসলামকেই ধর্ম বলে মানে। সেই ধর্ম এখনো ধর্মব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত এবং জনগণ তাদেরকেই সমীহ করে চলে। ধর্মব্যবসা যে ইসলামে নিষিদ্ধ, ধর্মব্যবসায়ী আলেমরা যে আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব তা তারা জানেই না, তাই ধর্মব্যবসায়ীদেরকে তারা টাকা দিয়ে পালন করে। ঐক্যের বিরুদ্ধে কথা বলা যে কুফর সেটাও তারা জানে না, তাই তারা এখনো নিজেদেরকে শিয়া, সুন্নি, হানাফি বলে বিশ্বাস করে, নিজেদের মধ্যে ফেরকা মাজহাবের দেওয়ালকে লালন করে। এমনকি পশ্চিমাদের বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট বলে তারা মনে করে, পশ্চিমাদেরকেই প্রভু মনে করে, তাদের তৈরি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উপর ভিত্তি করা শত শত রাজনীতিক দলে বিভক্ত হয়ে নিত্য দাঙ্গা-ফাসাদ, হানাহানি, মারামারিতে লিপ্ত। অর্থাৎ চূড়ান্ত অনৈক্য বিরাজিত। সেখানে এখনই এ জাতির সামনে 'কোর'আনের শাসন চান কি চান না', না বলে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সমাজের মানুষগুলোকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝানো, ঐক্যের সুবিধা, অনৈক্যের অসুবিধাগুলো বুঝানো। তাদেরকে সর্ব উপায়ে বোঝানো যে, কোন কাজ করলে সেটা আল্লাহর এবাদত হবে, কোন কাজ আল্লাহর কাছে প্রিয়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে মানুষগুলোকে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্যবোধের চেতনা জাগ্রত করাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। তারপর সমস্ত জাতি যখন এই কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে যে, আমরা ষোল কোটি মানুষ সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, হকের পক্ষে থাকব তখন তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে, তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে কীসের ভিত্তিতে হবে।

সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে যারা রাতারাতি একটি সংবিধান প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে চান তাদের ভুলটাও তুলে ধরতে হবে যেন কেউ সেই পথে পা না বাড়ায়। মনে রাখতে হবে, ইসলাম কেবল কয়েকটি বিধানের সমষ্টি নয়, এটি একটি সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন যার স্থায়িত্ব হতে পারে হাজার হাজার বছর। একটি সভ্যতার সঙ্গে একটি জাতির পরিচয়, সংস্কৃতি, জীবনযাপন, পেশা, সামগ্রিক জীবন, শিল্প, সাহিত্য, গান, স্থাপত্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পোশাক আশাক সবকিছু জড়িত থাকে। সুতরাং একটি বই থেকে কয়েকটি আইন চালু করে দিলেই কি সেটাকে সভ্যতা বলা যাবে? যাবে না। সর্বশ্রেণির মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে না। এ কারণেই তালেবানরা রাজ্যজয় করতে পারলেও মানুষের মনজয় করতে পারে নি। যেটা রাতারাতি প্রতিষ্ঠা হয় সেটা রাতারাতি উৎখাতও হয়। রাতারাতি বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বহু ঘাত প্রতিঘাত সইতে হয়েছে, বিশ্বময় এই

মতবাদগুলোর ইতিবাচক নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে, হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে, গণমাধ্যমে ঝড় তোলা হয়েছে। এভাবে এই আদর্শগুলো মানুষের মনে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তারপর চলেছে পরীক্ষা নীরিক্ষা, সংস্কারসাধন। আদর্শ প্রতিষ্ঠার এটিই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক রীতি। যারা সহিংসতার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তারা কোথাও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হন নি, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, এমন কি সমাজতন্ত্রের পথিকৃৎগণও তাদেরকে সমর্থন দেন নি।

আল্লাহ চান মানুষজাতি যেখানেই থাকুক ঐক্যবদ্ধ থাকুক। কারণ তিনি মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সেই সমাজে জুলুম না থাকুক, অবাধ বাক স্বাধীনতা থাকুক, অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি না থাকুক, শাসকের জবাবদিহিতা থাকুক এটাই আল্লাহ চান। আমরাও এটা চাই। আমরা মানুষকে এগুলোর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই- কারণ ঐক্যবদ্ধ না হলে এই চাওয়া কখনোই পূর্ণ হবে না। এক কথায় মানুষ ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয় তাহলেই সমাজের মধ্যে যদি শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের এই ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামের অধিকাংশ বিধান আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বাদ থাকে শুধু দণ্ডবিধি বা পিনাল কোড। সেটা জনগণই ঠিক করে নেবে যে তারা এই পিনাল কোড চায় কি চায় না।

জনগণের সামনে যুক্তি, তথ্য-প্রমাণ দিয়ে একটা সিস্টেমের অসুবিধা বা অসঙ্গতি, ত্রুটি, ব্যর্থতা ইত্যাদি উপস্থাপন করার ফলে যদি তারা নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয় তখন তাদের সামনে আরেকটা ব্যবস্থার মাহাত্ম, শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তি দিয়ে তুলে ধরা অতঃপর মানুষ যদি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয় তবে সেক্ষেত্রে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। যদি তারা কোর'আনের পিনাল কোড না চায় সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। এমনকি আমরা এও বলছি না যে কেবল কোর'আনই স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা। যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী তারা হয়তো কোর'আনের বদলে বেদের বিধানকে উত্তম মনে করবেন, ইহুদিরা চাইবে তওরাতের বিধান। অসুবিধা নেই, ওগুলো সবই স্রষ্টারই বিধান। ওগুলো দিয়েও শান্তি এসেছে। মদিনায় ইহুদিরা কোর'আনের বিধানের বদলে তওরাতের বিধান দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড কামনা করেছিল, কারণ সেটাকেই তারা সুবিচার বলে বিশ্বাস করত। রসুলাল্লাহ সেটা মোতাবেকই তাদের বিচার করেছিলেন। এখনো কোনো অপরাধী যদি ব্রিটিশ পিনাল কোড মোতাবেক নিজের দণ্ড চায়, তার উপর জোর করে কোর'আনের কানুন চাপিয়ে দেওয়াকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। রাষ্ট্রগঠনের আধুনিক সংজ্ঞায় জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে রাষ্ট্র। জনগণ কী চায় সেটাই মুখ্য। জনগণ যদি বলে আমরা তিনশত বছর ব্রিটিশ রুল দেখেছি। এটা আমাদেরকে শান্তি দিতে পারে নাই, তাহলে তারা সেটা আর মানবে না। আর যদি বলে আমরা এই অশান্তির মধ্যেই থাকতে চাই। তাহলে ধর্ম সেটাকে উৎপাটন করে জোর করে কোর'আনের বিধান চাপিয়ে দেবে না। কারণ জোর করা ধর্মের কাজ নয়, সেটা অধর্মের কাজ।

তবে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি যে, পশ্চিমা সভ্যতার যে জীবনব্যবস্থা মানুষকে শান্তি দিচ্ছে না, দিতে পারবে না। কারণ এগুলো মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বিধান আর স্বল্পজ্ঞানী মানুষ যে এক মিনিট পরে কী হবে তাও জানে না, সে কখনোই মানবজাতির শান্তির জন্য নিখুঁত একটি জীবনবিধান রচনা করতে পারে না। এগুলো প্রতারণামূলক ব্যবস্থা, এরা মানবাধিকারের কথা বলে, বাকস্বাধীনতার কথা বলে, রাষ্ট্রের কাজে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলনের কথা বলে, সুবিচারের কথা বলে, সাম্যবাদের কথা বলে কিন্তু কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু স্রষ্টার বিধানে এগুলো দেওয়া অতীতেও সম্ভব হয়েছিল, এখনও সম্ভব। এই বিশ্বাসটা আগে মানুষের মনে আমরা সৃষ্টি করতে চাই, তাহলে মানুষের সামনে কোনটা সত্য আর কোনটা প্রতারণা তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন মানুষই তার পথ বেছে নেবে। তবে আমরা মনে করি, আল্লাহর দেওয়া বিধানের চেয়ে সত্য, ন্যায়নিষ্ঠ, সুবিচারপূর্ণ কোনো বিধান হতে পারে না, তথাপি সেটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহর নীতি পরিপন্থী।

পশ্চিমা প্রিজমে দেখলে হেযবুত তওহীদকে চেনা যাবে না

রুফায়দাহ পন্নী
উপদেষ্টা, দৈনিক বজ্রশক্তি

বর্তমানে ইসলামের অনেকগুলো প্যাটার্ন বা রকমফের আমরা দেখতে পাই। একেক দেশে একেকরকম ইসলামের চর্চা হয়। ইন্দো-মালয় অঞ্চলে একরকম, আরবে একরকম, ইরানে একরকম, আফ্রিকায় একরম, ভারতে একরকম, বাংলাদেশে আরেকরকম। আমাদের এখানে ইসলামের নামে অনেক কিছুই চলে যা আরবেরা জানেই না। অর্থাৎ হালবিহীন নৌকা যেমন যেদিকের বাতাস পায় সেদিকেই ঘুরে যায় ইসলামের অবস্থাটা সেই রকম দাঁড়িয়েছে। ইসলামের নামে অনেক যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক চর্চা, কুসংস্কার, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি চলছে যা দেখে অনেক মানুষ কেবল ধর্মবিদ্বেষী নয়, ধর্ম অস্বীকারকারীই হয়ে যাচ্ছেন। এ হলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা, এর বাইরে যারা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের মধ্যেও অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে। ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রে মতবাদ ও কৌশলগত শ্রেণিভেদে যে শব্দগুলো আমরা পশ্চিমা মিডিয়ায় বেশি ব্যবহৃত হতে দেখছি তার কয়েকটি হচ্ছে:

১. মিলিট্যান্ট ইসলাম
২. পলিটিক্যাল ইসলাম
৩. মডারেট ইসলাম
৪. লিবারাল ইসলাম
৫. সুফিস্টিক ইসলাম
৬. এক্সট্রিমিস্ট ইসলাম
৭. কনজারভেটিভ ইসলাম
৮. র‍্যাডিকেল ইসলাম
৯. ফান্ডামেন্টালিস্ট ইসলাম
১০. জিয়োলট্রিক ইসলাম
১১. প্যান ইসলামিজম
১২. ফ্যানাটিক ইসলাম
১৩. কম্যুনিস্ট ইসলাম

এই প্রকারভেদের কোনো কোনোটির মধ্যে পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম, কোথাও মোটা। যে কোনো ইসলামপন্থী ব্যক্তি ও আন্দোলনকে এর যে কোনো পর্যায়ভুক্ত (Categories) করে বিবেচনা করা হয়। এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবিরা উপরের কোন শ্রেণিভাগে পড়েন? প্রত্যেক দলের লোক তাদের নিজেদের দলেই আল্লাহ-রসুলকে টানতে চাইবেন, তাই এ প্রশ্নের সমাধান হওয়া অতীব জরুরি হলেও সহজ নয়।

এই প্রকারভেদগুলো কীভাবে আসলো, কারা করল, কখন থেকে এগুলো শুরু হলো? এই ইতিহাস সবাই জানেন যে, ইসলামপূর্ব আরব জনগোষ্ঠী কেমন ঐক্যহীন, বিশৃঙ্খল, শিক্ষাদীক্ষাহীন, হতদরিদ্র, পারস্পরিক বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত অর্থাৎ এক কথায় দারুণ অন্যায়-অবিচার, বর্বরতায় পূর্ণ ছিল। এমন একটি অধঃপতিত জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর রসুল এমন একটি মহান জাতিতে পরিণত করলেন যারা পরবর্তী মানবজাতির ইতিহাসের গতিই বদলে দিল। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক সমৃদ্ধি এক কথায় সর্ব বিষয়ে তারা অন্য জাতির শিক্ষকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। এই ধারাটি অব্যাহত রাখার দায়িত্ব ছিল পরবর্তী উম্মতে মোহাম্মদীর বা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর। কিন্তু তারা অর্ধ-দুনিয়ার অধীশ্বর হয়ে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেল। আর্ত-অসহায় মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম ত্যাগ করে তারা পারস্য ও রোমান রাজা বাদশাহদের অনুকরণে মালিক-সুলতান সেজে রাজত্ব করতে লাগল। জাতি হয়ে গেল স্থবির। বদ্ধ পুকুরের পানি যেমন দূষিত হয় তেমনি ইসলামও দূষিত হতে শুরু করল। কবিগুরুর ভাষায়, যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে/সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে। যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়/পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার। প্রায় এক হাজার বছর এই পচনক্রিয়া চলল।

এই বিস্তৃত সময়কালে একদিকে মোফাসসের, আলেম, ফকীহ, বিবিধ মজহাবের ইমাম, মোহাদ্দেস, তার্কিকদের অতি বিশ্লেষণে সহজ সরল ইসলাম জটিল, দুর্বোধ্য মাসলা মাসায়েলের জালে বন্দী হয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে চলে গেল, অপরদিকে পীর, মাশায়েখ ও

বিকৃত সুফিবাদের প্রভাবে উম্মাহর বহির্মুখী চরিত্র অন্তর্মুখী, ঘরমুখী হয়ে গেল। তারা সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চরিত্র হারিয়ে নির্বিরোধী সুফি, মুত্তাকি, পরহেজগার বান্দা হওয়ার দিকে মুখ ফেরাল। অর্থাৎ এই জাতির ধর্মই (গুণ বা বৈশিষ্ট্য) পাল্টে গেল। এরই মাঝে ইসলামের যে একক জাতিসত্তা রসুলাল্লাহ নির্মাণ করে গিয়েছিলেন তার ধারণাও লুপ্ত হয়ে গেল। শত সহস্র ফেরকা, মজহাব, তরিকায় বিভক্ত হয়ে জাতিটি আল্লাহর দৃষ্টিতে আর মো'মেন রইল না, উম্মতে মোহাম্মদী রইল না, হয়ে গেল উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, সেলজুক, মামলুক, তুর্কী, মোগল, পাঠান ইত্যাদি বংশীয় রাজতান্ত্রিক শাসক ও শাসিত। এই এক হাজার বছরে তারা যত যুদ্ধ করেছে তার প্রায় সবই করেছে সাম্রাজ্যবিস্তার ও পরসম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে যা ছিল আল্লাহর হুকুম ও রসুলাল্লাহর নীতিমালা পরিপন্থী। ইসলামের সবচেয়ে বেশি বদনাম হলো এজন্য যে, ঐ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালিপ্সু ভোগী রাজা বাদশাহরা নিজেদেরকে ধর্মে মুসলিম বলে পরিচয় দিতেন ফলে শেয়াল কুকুরের মতো সেই স্বার্থের হানাহানির ইতিহাসকেই আজ ইসলামের ইতিহাস বলে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণি ইসলাম সেই পারস্পরিক কামড়া-কামড়ি, ধর্মের নামে অধর্ম অনাচার, আর ভোগবিলাসের ইতিহাস পড়ে ইসলাম সম্পর্কে একটি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কিছুর একটা শেষ আছে, পচনের পর পতন আছে। এই মুসলিম দাবিদার কার্যত কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) জনগোষ্ঠীরও পতন ঘটল অত্যন্ত করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় জাতিগুলো আল্লাহর শাস্তিরূপে এ জনগোষ্ঠীর উপর আপতিত হলো। আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত তদানীন্তন অর্ধ পৃথিবীতে বিরাট সংখ্যা নিয়ে বিরাজিত ঐক্যহীন, লক্ষ্যহীন, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন উম্মতে মোহাম্মদী দাবিদার কিন্তু কার্যত কাফের জনগোষ্ঠীকে সামরিক শক্তি দিয়ে পদানত করল। এ জাতি যেন কোনোদিনও আর মাথা তুলতে না পারে, পশ্চিমা সভ্যতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিজেদেরকে নিকৃষ্ট বলে ভাবতে শেখে, দাসত্বকেই মর্যাদা বলে ভাবতে শেখে, ঔপনিবেশিক চাবুকের বিরুদ্ধে যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য তারা একাধারে দুই প্রকার (মাদ্রাসা ও সাধারণ) শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল। পরাজয়ের পর এই জাতির ভাগ্যে কী নির্মম পরিণতি নেমে এসেছিল সে ভয়াবহ, লোমহর্ষক ইতিহাস, যা বর্ণনা করতে গেলে হাজার হাজার পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এক ক্ষুদ্রাংশের বর্ণনাও শেষ হবে না, সেই ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুরতার ইতিহাস না শেখানো হচ্ছে আলেমদের, না শেখানো হচ্ছে শিক্ষিতদের। একটা পর্যায়ে এসে এ জাতির কিছু লোক গোলামির হাত থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা কেউ জাতীয়বাদের চেতনায়, কেউ ধর্মীয় চেতনায় বিভিন্ন দল গড়ে তুলতে লাগল। এগুলির মধ্যে ছোট ছোট দল ও সংগঠনও আছে আবার মিশরের ইখওয়ানুল মুসলেমিন ও আল-জেহাদ, আলজেরিয়ার ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট ও জাম'য়া, তিউনিশিয়ার আন-নাহদা, মালয়েশিয়ার আল আরকাম, ইন্দোনেশিয়ার দারুল ইসলাম ও এই উপমহাদেশের জামায়াতে ইসলামীর মত সংগঠনও আছে। এদের কোনোটি পাশ্চাত্যের ছকে বাঁধা রাজনীতিক পদ্ধতিতে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, কোনোটি চরমপন্থা নিয়েছে। আর বর্তমানের জঙ্গিবাদ? সেটা তো রাশিয়া-আফগান যুদ্ধে মার্কিনদের সৃষ্টি করা আল কায়েদার মত দল যার সবগুলোই পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষণে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে আছে তালেবান, বোকো হারাম, আল শাবাব, হামাস, হেযবুল্লাহ, হরকাতুল জেহাদ, লস্কর-ই-তাইয়্যেবা ইত্যাদি। আমাদের দেশেও তাদের বিভিন্ন নামে তাদের কর্মকাণ্ড আছে। এদের উদ্যোগগুলো দীর্ঘ সংগ্রামের পর ব্যর্থ হয়েছে, অনেকে এখনো চেষ্টা চালাচ্ছে, তারাও ব্যর্থ হবে। ব্যর্থতাই সেগুলোর স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ তারা যে ইসলাম নিয়ে দাঁড়িয়েছে (বা দাঁড় করানো হয়েছে) সেটা আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়। এ কারণে আল্লাহর কোনো সাহায্য তারা পায় নি, আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর রসুলের পক্ষেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। যে 'ইসলাম' আদৌ ইসলামই নয়, যা ১৩০০ বছরের অতি বিশ্লেষণকারী আলেম ওলামাদের মনগড়া বিকৃত বিধিবিধানের সমষ্টি সেটাকে প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ কেন সাহায্য করবেন? তাদের কারো কাছেই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা না থাকায় তারা যেখানেই ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে সেখানেই বিবেকহীন, অমানবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মনে ভীতি, আতঙ্ক, ইসলামের ব্যাপারে তিক্ত মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বজোড়া সেই ধর্মান্ধতার অতিরঞ্জিত বিবরণ ইসলাম-বিদ্বেষের আগুনে

অন্যান্য দলের সঙ্গে হেযবুত তওহীদের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো ঐ জঙ্গি দলগুলো আসলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, কারণ ইসলাম অর্থ শান্তি। তারা চায় নারীদের বোরকা পরাতে, চায় পিটিয়ে নামাজ পড়াতে, পুরাকৃতি ভেঙে ফেলতে, শরীয়াহ আইনের নামে শিরোচ্ছেদ আর মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করতে, নারীদেরকে শিক্ষা ও বহির্জগতের কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত করতে, পুরুষদেরকে দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করতে, গান-বাদ্য, নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করতে।

ঘি ঢেলে দিয়েছে।

দুনিয়াজোড়া শত শত ইসলামী দলকে পশ্চিমা তাত্ত্বিক, সমাজবিদ, মিডিয়া বাহিনী শ্রেণিবিন্যাস করেছে। তাদেরই অনুকরণে এ দেশের সাংবাদিক, কলামিস্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিকগণও ঐ একই ফ্রেমে এদেশের সংগঠন বা আন্দোলনগুলোকে ফেলে বিচার করেন। হেযবুত তওহীদকেও সেইভাবেই বিচার করা হয়েছে। যেহেতু হেযবুত তওহীদ সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায়) প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাই হেযবুত তওহীদকেও চরমপন্থী অথবা চরমপন্থী হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়।

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য এমামুয্যামান প্রায়ই একটি উদাহরণ দিতেন। তিনি বলতেন, ধরুন- আমার আর আপনার দুজনেরই একটা করে নাক আছে, দুটো করে কান আছে, দুটো করে হাত পা আছে, এমনকি আপনার নামের সঙ্গে আমার নামেরও খানিকটা মিল আছে, দুজনেই খাই, দুজনেই ঘুমাই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমি আর আপনি এক ব্যক্তি। কারণ আমাদের অমিলও আছে হাজারটা । জঙ্গিরাও আল্লাহ বিশ্বাস করে আমরাও বিশ্বাস করি, নিজেদেরকে রসুলের উম্মাহ দাবি করে আমরাও করি, তারা কোর'আনকে আল্লাহর কেতাব মনে করে আমরাও করি, তারা কাবাকে আল্লাহর ঘর মনে করে আমরাও করি, তারা হাশর-কেয়ামত বিশ্বাস করে আমরাও করি, এসব মিল থাকার মানেই এই নয় যে আমরা আর তারা এক হয়ে গেলাম। কারণ ঐ সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও আমাদের লক্ষ্য এক নয়, তাদের কর্মসূচি আমাদের কর্মসূচি এক নয়, তাদের কর্মকাণ্ড ও আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তাদের আদর্শ এবং আমাদের আদর্শও এক নয়। এই পার্থক্য যে বুঝতে পারে না, সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। কোনো একটি ভূখণ্ড দীর্ঘদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী, কিছুতেই স্বাধীনতা আসছে না, তখন ইসলামের সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করে স্বাধীনতার যুদ্ধকে জেহাদ-কেতাল বলে চালিয়ে দিচ্ছে কিংবা একটি সরকার পতনের আন্দোলনকে সফল করার জন্য ইসলামি সেন্টিমন্টের সাহায্য নিচ্ছে। আবার তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রী করছে পশ্চিমারা। এভাবেই আসছে জঙ্গিবাদ।

অন্যান্য দলের সঙ্গে হেযবুত তওহীদের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো ঐ জঙ্গি দলগুলো আসলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, কারণ ইসলাম অর্থ শান্তি। তারা চায় নারীদের বোরকা পরাতে, চায় পিটিয়ে নামাজ পড়াতে, পুরাকৃতি ভেঙে ফেলতে, শরীয়াহ আইনের নামে শিরোচ্ছেদ আর মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করতে, নারীদেরকে শিক্ষা ও বহির্জগতের কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত করতে, পুরুষদেরকে দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করতে, গান-বাদ্য, নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করতে। তারা ভাবে এগুলো করলে শান্তি আসবে। কিন্তু এভাবে কোথাও শান্তি আসে নি। প্রমাণ আফগানিস্তান, আই.এস শাষিত অঞ্চল, সৌদি আরবসহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো। মূল বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব চলমান সভ্যতার সংঘর্ষে পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে যৌক্তিক কারণে ইসলামকে প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারাই বিভিন্ন দেশের এই ইসলামিক দলগুলোকে ব্যবহার করছে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলিমদেরকে দিয়ে মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য এবং মুসলিম দেশগুলোতে সামরিক (জঙ্গি) আগ্রাসন চালানোকে জায়েজ করণার্থে টুইন টাওয়ার জাতীয় কিছু ধ্বংসাত্মক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যই এই জঙ্গিগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছে। অস্ত্র বাণিজ্যভিত্তিক যুদ্ধ অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য জঙ্গিদেরকে পশ্চিমাদের প্রয়োজন। তাদের এ স্ব-স্বীকৃত তথ্য যা একটি ওপেন সিক্রেট তা সচেতন সকলেই অবগত আছেন। এই জঙ্গিবাদী দলগুলো জেহাদ ও কেতালের নামে সন্ত্রাস করছে, বোমাবাজি করছে আর এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী তাদের এই কাজগুলো কেন ইসলামসম্মত নয় সেটা তাঁর বইতে তুলে ধরছেন এবং হেযবুত তওহীদ সেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম করছে- এটাই হচ্ছে মোটাদাগে সেই জঙ্গি দলগুলোর সঙ্গে হেযবুত তওহীদের তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক অঙ্গনের পার্থক্য।

পক্ষান্তরে হেযবুত তওহীদ হচ্ছে সেই প্রকৃত ইসলাম যা আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী (দ.) পর্যন্ত সকল নবী-রসুল-অবতারগণ নিয়ে এসেছিলেন, যার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে মানুষের চিন্তা, কথা, পছন্দ-অপছন্দ, চলাফেরা, গবেষণার স্বাধীনতা থাকবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষ হবে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার হবে শুধু মানুষের কল্যাণে। প্রতিটি মানুষ দয়া-মায়া, সহযোগিতা, ঐক্য-শৃঙ্খলায় পূর্ণ থাকবে। এখন যেমন পুলিশের চোখ এড়াতে পারলেই জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তখন তা হবে না, ধার্মিক ও নাস্তিক উভয়ের হৃদয়ে নৈতিকতার শক্তিশালী বোধ জাগ্রত হবে যার পরিণামে কেউ কারো অধিকারে হাত দেবে না, কাউকে দিতেও দেবে না। পরিণামে সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক সমৃদ্ধি, ভালোবাসায় পূর্ণ একটি স্বর্গরাজ্য হবে এই মানবসমাজ। এটা কোনো সমাজতাত্ত্বিকদের ইউটোপিয়া নয়। প্রকৃত ধর্ম দ্বারা, নবী-রসুলদের দ্বারা এমন স্বর্গরাজ্য অতীতে বার বার হয়েছে, এবার সেটাই হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে ইনশা'আল্লাহ। কারণ হেযবুত তওহীদ পৃথিবীতে আল্লাহর স্বাক্ষর, স্বয়ং আল্লাহ এ আন্দোলনের পরিচালক, সমগ্র মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য আল্লাহর অভিপ্রায় বাস্তবায়িত হবে এই হেযবুত তওহীদের দ্বারা। তাই আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে হেযবুত তওহীদকে সাহায্য করে যাচ্ছেন, এই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার যুগেও অকাট্য সত্যের পক্ষে উন্নতশির ও অটল রেখেছেন। তাই হেযবুত তওহীদ পশ্চিমাদের বাঁধানো কোনো ছকেই পড়বে না। হেযবুত তওহীদ কী, এমামুয্যামান কী বলতে চেয়েছেন, তা হেযবুত তওহীদেরও অনেকেই পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে হেযবুত তওহীদকে আরো গভীরভাবে জানুন। যে কোনো ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকলে যত ইচ্ছা আমাদেরকে প্রশ্ন করুন, এনশা'আল্লাহ জবাব দেওয়া হবে। আমরা সত্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি, আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বক্রতা নেই এবং সত্য বলার ক্ষেত্রে আমরা দ্বিধান্বিত বা বিব্রত নই যদি তা আমাদের বিরুদ্ধেও যায়।

মাননীয় এমামুয্‌যামান
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

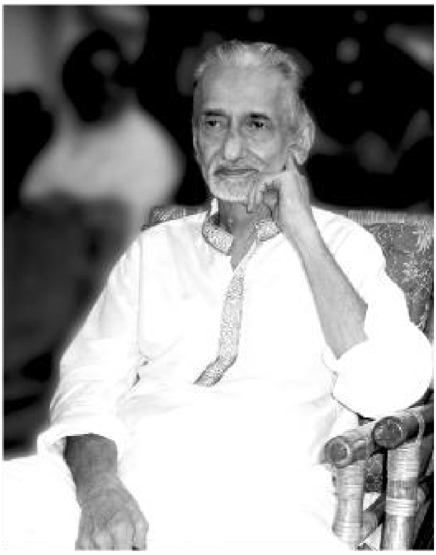

মাননীয় এমামুয্‌যামান করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ শাবান (লায়লাতুল বরাত) ১৩৪৩ হেজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ, ২৭ ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, শেষ রাতে নানার বাড়িতে (টাঙ্গাইল শহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হয়েছিল করটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্‌যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হয়েছিল এমামুয্‌যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত করে ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন যা বর্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কলকাতা ছিল এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্‌যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছিল যথা- মাহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু'র নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্‌যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক অপেক্ষাকৃত ছোট একটি আন্দোলনে। আন্দোলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও অনন্য শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্‌যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের (Special Assignment) জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত)

এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যমানের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করে অবসর সময় পার করতে থাকেন, যদিও কোনো ব্যবসাতেই তিনি সফলতার মুখ দেখেন নি। আর সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। এই সময়ের শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন যা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয় এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রয়োগ করে জনগণকে এর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো। ইউরোপে উদ্ভূত এবং বিকশিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ শাসকরা জোর করে প্রাচ্যদেশীয় উপনিবেশগুলিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়েছিল, যদিও এটি এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মনোবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তান সরকারও একই নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল। ফলে স্বভাবতই নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে লাগলো এবং এই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান আর সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে চলল। এমামুয্যামান এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে এসে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং টাঙ্গাইল হোমিও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সনে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রী অর্জন শেষে নিজ গ্রামে চিকিৎসা শুরু করেন।

এমামুয্যামানের চাচাতো ভাই জনাব খুররম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে উক্ত আসনটি শূন্য হয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল এ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (Constituency) পরিবর্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে পরাজিত হন এবং নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। এরপর তিনি পুনরায় চিকিৎসার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছোটবেলায় যখন তিনি মুসলিম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করছিল। মুসলিম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমতো সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে

আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন করলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিল, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হলো যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে (Super power) সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত করে ফেলল, তাও আলাদা আলাদা ভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্তমানে বিকৃত আকিদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই পরশপাথর হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দি পর থেকে এই দীন বিকৃত হতে হতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার ইসলামের সাথে বর্তমানে ইসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হচ্ছে তার কোনোই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোনো মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি ইসলামের মধ্যে কোনোই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকিদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' নামে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেন যা ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পরপর স্বভাবতই বর্তমানের বিকৃত ইসলামের ধারক বাহক মোল্লা শ্রেণি তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে অপপ্রচার শুরু করে যে তিনি খ্রিষ্টান হয়ে গেছেন, পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। তারা মসজিদে মসজিদে খোতবা দিয়ে, ওয়াজ করে এমামুয্যামানের নামে বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। তারা এমন সব মিথ্যা কথা তাঁর নামে প্রচার করল যেগুলি কেবল ভিত্তিহীনই নয় নিতান্ত হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিক, যেমন তিনি ইহুদি খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে টাকা পান, তিনি ও তার অনুসারীরা পুবদিকে ফিরে সালাহ কায়েম (নামাজ) করেন, মৃতদেহকে কালো কাফন পরান ও বসিয়ে দাফন করেন ইত্যাদি, এমন কি এর চাইতেও জঘন্য মিথ্যাচার তারা চালাতে থাকে। পাশাপাশি তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়ে, প্রভাব খাটিয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত করতে চাপ প্রয়োগ করে। আশ্চর্যজনক হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোল্লাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং কোনো রকম আত্মপক্ষ সমর্থন বা ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ না দিয়ে, এমনকি বইয়ের লেখক মাননীয় এমামুয্যামানকে পর্যন্ত না জানিয়ে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করে। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন।

এদেশের অনেকগুলি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম ঘোর ইসলাম-বিরোধী। তাদের এই ইসলাম-বিরোধী মনোভাবের প্রধান কারণ দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের গোলামি করা, যার ফলশ্রুতিতে সকল বিষয়ে শাসকদের অন্ধ-অনুকরণ করা তাদের চরিত্রে পরিণত হয়েছে। বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভ করলেও তারা এখনও পশ্চিমা শাসকদের প্রভাব বলয় এবং মানসিক দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেন নি, তাদের মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা এখনও খ্রিষ্টান শাসকদের প্রতি অপরিসীম হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন। তাদের প্রভুরা যেহেতু ইসলামের ঘোর বিরোধী, তাই এই মিডিয়াও ইসলামের বিরোধী। তাই মোল্লাদের পাশাপাশি তারাও তাদের পত্র-পত্রিকায় ও রেডিও, টিভি, ইন্টারনেটে গত ১৭ বছর ধরে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে গেছে এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের এই অপপ্রচার তাতে তারা পুরোপুরি সফলও হয়েছে। হেযবুত তওহীদকে তারা মানুষের কাছে একটি জঙ্গি, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী দল হিসাবে চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য অতি সম্প্রতি

অনেকেই তাদের ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার থেকে বিরত হয়েছেন। যাই হোক, মোল্লা ও মিডিয়ার এই এক তরফা অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হেযবুত তওহীদের মতো দরিদ্র আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে বিরোধীদের প্রচারিত মিথ্যাগুলিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে। অথচ গত ১৮ বছরে এমামুয্যামানের কোনো অনুসারীর দ্বারা একটি মাত্র আইনভঙ্গ বা একটি মাত্র অপরাধমূলক কাজে জড়িত হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে এডলফ হিটলারের গণসংযোগ মন্ত্রী ড: গোয়েবলস এর নীতি অবলম্বন করেছেন, যিনি বলতেন, "একটি মিথ্যাকে যদি বহুবার এবং উপর্যুপরিভাবে প্রচার করা হয় তাহলে লোকে সেই মিথ্যাকেই একসময় সত্য হিসাবে গ্রহণ করে নেবে।" ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা ও মিডিয়ার এই অবিশ্রান্ত অপপ্রচার দ্বারা এভাবেই হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কথা এখন সত্য হিসাবে গৃহীত হয়ে গেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এগুলি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে তারা গত সতের বছরে এমামুয্যামানের অনুসারীদেরকে ৪১০ বার জেল হাজতে পাঠিয়েছেন, তারপরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করেছেন কিন্তু একবারও তারা এ আন্দোলনের একজনকেও আদালতে দোষী প্রমাণিত করতে পারেন নি। চলমান কয়েকটি ঘটনা ছাড়া প্রতিটিতেই তারা অব্যহতি লাভ করেছেন। বাকীগুলিতেও ইনশা'ল্লাহ তারা অতি শিগ্রই অব্যহতি পেয়ে যাবেন।

১৯৯৮ সনে মাননীয় এমামুয্যামানের আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "দাজ্জাল? ইহুদি খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!" প্রকাশিত হয়। এ বইতে তিনি রসুলাল্লাহর হাদিস ও বাইবেলের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, বর্তমান দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক, বস্তুবাদী 'সভ্যতা'ই বিশ্বনবী বর্ণিত একচক্ষু দানব দাজ্জাল। বইটি ২০০৮ সনে বাংলাদেশে এটি ছিল সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই (Bestseller)। তাঁর রচিত অন্যান্য বইগুলি হচ্ছে:

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, ২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ, ৩. জেহাদ, কেতাল, সন্ত্রাস, ৪. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার করেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩–৬৫)।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

নারী-পুরুষের

সৃষ্টিগত পার্থক্য ও তাদের দায়িত্ব

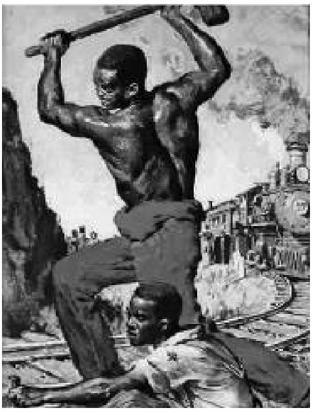

মানবজাতিকে আল্লাহ সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মূল দায়িত্ব হচ্ছে এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা তথা আল্লাহর হুকুম (তওহীদ) মোতাবেক শাসন করা, মানবজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। প্রতিটা ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে যা নির্ধারিত হয় তার মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে। মানুষের মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু'টি সৃষ্টি - নারী ও পুরুষ। শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠনে এদের উভয়েরই স্রষ্টা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা তাদের গঠন কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিশীল। প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন পরিবারে নারী ও পুরুষ সদস্য থাকে, শিশুর জন্ম হয়, তার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিচর্যা, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। পরিবারের বয়স্ক মানুষদের দেখা-শুনা, অসুস্থদের সেবা-শুশ্রুষা, অতিথিদের আপ্যায়ন ইত্যাদি করতে হয়। সব পরিবারেরই বড় একটি কাজ হলো অর্থের যোগান, সার্বিকভাবে পরিবারকে প্রতিপালন করা। কাজেই পরিবারের কে কোন কাজ করবে তার একটি সাধারণ শৃঙ্খলা অপরিহার্য। একটি শিশুর পক্ষে যেমন শক্ত কাজ করা সম্ভব নয় তেমনি পরিবারের বয়স্কদের পক্ষেও পরিশ্রমের কাজ করা অসম্ভব। পুরুষ যে কাজ অনায়াসেই করতে পারে নারীর পক্ষে তা কষ্টকর। একারণে নারী ও পুরুষের গঠন-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে পরিবারে তাদের দায়িত্বের সাধারণ শৃঙ্খলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ।পুরুষ শারীরিক দিক থেকে নারীর চেয়ে শক্তিশালী, তার পেশী, বাহু, হাড়ের গঠন, মেরুদণ্ড এক কথায় তার দেহকাঠামো নারীর তুলনায় অধিক পরিশ্রমের উপযোগী, প্রকৃতিই তাকে রুক্ষ পরিবেশে কাজ করে উপার্জন করার সামর্থ্য বেশি দান করেছে, তাই পুরুষের দায়িত্ব হলো সে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে, কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলিয়ে, শিল্পকারখানায় কাজ করে উপার্জন করবে এবং পরিবারের ভরণপোষণ করবে। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরুষকে আল্লাহ নারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন, নারীর অভিভাবক করেছেন। এটা মানব সমাজে বিশেষ করে পরিবারে পুরুষের বুনিয়াদি দায়িত্ব। অপরদিকে নারীদেরকে আল্লাহ সন্তান ধারণের উপযোগী শরীর দান করেছেন, সন্তানবাৎসল্য ও সেবাপরায়নতা দান করেছেন। তাই প্রকৃতিগতভাবেই তাদের মূল কাজ হচ্ছে সন্তানধারণ করা, তাদের লালন-পালন করা, রান্না-বান্না করা এক কথায় গৃহকর্ম করা। বিশেষ প্রয়োজন হলে পারিবারের অর্থ যোগানোর কাজে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিন্তু সেটা তাদের মূল কাজ নয়। তবে মনে রাখতে হবে এটি পারিবারিক শৃঙ্খলা। সমাজ ও জাতি গঠনে পুরুষের পাশাপাশি যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নারীদের সকল কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকার ও উদাহারণ ইসলামে রয়েছে। প্রকৃত ইসলামে নারীরা আল্লাহর রসুলের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধাহতদের সেবা করেছে, যুদ্ধের রসদ সরবরাহের কাজ করেছে। সর্বপোরি পুরুষ মোজাহেদদের যুদ্ধের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। প্রকৃত ইসলামে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, হাসপাতাল পরিচালনা করেছে এবং স্বয়ং যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি থেকে তারা

নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [সূরা রূম: ২১]

সৃষ্টির প্রথম মানব আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর স্রষ্টা তাঁকে স্বর্গে বা জান্নাতে থাকতে দিলেন। যেখানে খুশি যাবার, যা খুশি খাবার, যা খুশি করার অনুমতি দিলেন। অথচ স্বর্গ সুখের মাঝে থেকেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, দুঃখী আর উদাসীন। কিসের যেন প্রচন্ড অভাব বোধ করছিলেন। তারপর তাঁর অন্তরের প্রশান্তির জন্য, তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য স্রষ্টা মা হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন। জান্নাতের সুখ বা স্বর্গ সুখ যাকে ছাড়া মলিন ছিল সে-ই হলো নারী, সমস্ত রকম সুখ শান্তি যাকে ছাড়া অপূর্ণ ছিল সে-ই হলো নারী। নারী হলো শান্তির পায়রা, সুখের আধার। জান্নাতের সুখকে পরিপূর্ণ করে দেবার জন্য নারীর সৃষ্টি। অর্থাৎ সমাজ, সংসার ও পরিবারে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নারীকে সৃষ্টি করা হলো। প্রত্যেকটি মানব শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয় হলো তার পরিবার এবং প্রথম শিক্ষক হলো তার মা। মা সন্তানকে যা শিখাবে তাই তার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে। সন্তানের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায় মা, সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে মা। তেমনি স্বামীর জন্য ও তার স্ত্রী হলো অনুপ্রেরণা, জীবনে চলার পথের বিশ্বস্ত একজন সাথী। অর্থাৎ নারী কখনও মা হয়ে, কখনও বোন হয়ে, কখনও স্ত্রী হয়ে, কখনও কন্যা হয়ে পরিবার ও সমাজের শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে। এককথায়, নারী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, বরকত ও নেয়ামত স্বরূপ।

অমানবিক কঠোর পরিশ্রম নারীর অধিকার নয় বরং অধিকার হারানোর পরিণতি

আমাদের সমাজে প্রায় নারীকে কঠোর কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে দেখা যায়। অনেকে বলে থাকেন এটা নাকি নারীর অধিকার। সেখানে পুরুষ ও নারীর সমান পারিশ্রমিক নিয়ে আন্দোলনও হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কঠোর পরিশ্রমের কাজগুলো করতে পারা নারীর অধিকার নয়, তার অধিকার হারানোর ফল। নারীর শারীরিক গঠন এই কাজের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। এগুলো পুরুষের উপযোগী কাজ। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের দায়িত্ব ছিল নারীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ সকল অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু পুরুষ যখন তা করতে ব্যর্থ হলো তখন নারীকে বাধ্য হয়ে এসব প্রয়োজন পূরণের ভার নিজ কাঁধে তুলে নিতে হলো। এভাবেই পুরুষের ব্যর্থতা নারীকে ঠেলে দিল তার জন্য অনুপযোগী ও ক্ষতিকর কাজগুলো করার দিকে। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জন্য এসব কাজ নিষিদ্ধ নয়। পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ না থাকায় নারীকে যদি তেমন কাজ করতে হয়, সে তা করতে পারে, তবে এর পরিণামে সে তার সহজাত শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে ফেলবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রকৃত ইসলামে নারী

প্রকৃত ইসলামে নারীরা কেমন ছিলেন, তারা ছিলেন মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, সেবিকা, কমান্ডার গভর্নর সহ অনেক কিছু। তারা আল্লাহর রসুলের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধাহতদের সেবা করেছে, যুদ্ধের রসদ সরবরাহের কাজ করেছে। সর্বপোরি পুরুষ মোজাহেদদের যুদ্ধের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অনেক নারী তার সারা জীবন তার স্বামীর সাথে জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। সেখানে সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং তাদের লালন পালন করেছেন। প্রকৃত ইসলামে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, হাসপাতাল পরিচালনা করেছে এবং স্বয়ং যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি থেকে তারা সব কাজে অংশগ্রহণ করেছে। আজ নারী শিক্ষার জন্য মৌলবাদীদের গুলিতে আহত হওয়ায় মালালা ইউসুফ জাইকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। পুরো বিশ্ব আজ তাকে এর জন্য চেনে। অথচ ১৪০০ বছর আগে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগের সেই বর্বরতা থেকে মুক্তি দেবার জন্য, মানবজাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেবার জন্য যে সুমাইয়া (রাঃ) নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁকে কয়জন চেনে? আহত লোকদের সেবা শুশ্রূষার জন্য ফ্লোরেন্স নাইটেংগেল এর নাম সবাই জানে, মাদার তেরেসার নাম সবাই জানে, অথচ রুফায়দাহ (রাঃ) যিনি আহত লোকজনের সেবার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলেন তাঁকে কতজন জানে? মক্কার ধনাঢ্য মহিলা ব্যবসায়ী ছিলেন আম্মা খাদিজা (রাঃ)। মানবতার কল্যাণের জন্য নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুবরণ করেন সেই ইতিহাস আমরা কয়জন জানি? আল্লাহর রসুল নারীদের পর্দার দোহাই দিয়ে ঘরের কোনায় বসিয়ে রেখেছিলেন এমন কোনো ইতিহাস তো আমরা পাইনা। তারা আল্লাহ রসুলের সাথে একসাথে সালাহ কায়েম করতেন, রসুলের সামনে বসে আলোচনা অনুষ্ঠান শুনতেন, এমনকি ব্যক্তিগত তুচ্ছ ঘটনাও রসুলের সাথে আলাপ করতেন। এইতো কয়েক বছর আগে নারীদের ভোটের অধিকার দিয়ে এবং সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব বলছে যে তারা নারীদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ১৪০০ বছর আগে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে যখন মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো সেই সময়ে আম্মা আয়েশা ১০,০০০ সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মক্কার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন আম্মা খাদিজা, মদীনার বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রের দায়িত্বে ছিলেন একজন নারী। মায়েরা তাদের সন্তানকে নিজের হাতে সাজিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী করে দিতেন আর বলতেন আল্লাহর রাস্তায় তথা মানবতার কল্যাণে জীবন উৎসর্গ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ শহীদ না হয়ে ফিরবেনা। সন্তানকে এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে সন্তান তার মায়ের মুখের কথা জীবন দিয়ে পালন করে গেছে। সেই ইসলাম হারিয়ে গেছে বহু পূর্বেই। যে ধর্ম নারীদের এমন অধিকার দিয়েছে দুঃখজনক বিষয় হলো সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে আজ নারীদের বাক্সবন্দী করে রাখা হচ্ছে। এই অচলায়তন থেকে নারীদের বেরিয়ে আসতে হবে অতি শীঘ্রই।

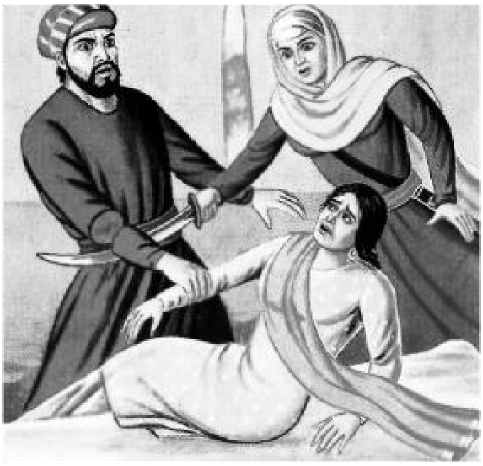

নারী নির্যাতনের প্রতিরোধ করছেন আরেক নারী

আপ্যায়নে নারী

যুদ্ধাহতকে সেবাদানে নারী।

যুদ্ধক্ষেত্রে নারী।

ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি করা নারী

আল্লাহর পক্ষ থেকে নারী যে কত বড় সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে এসেছে, নারীকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হলো সে প্রকৃত ইতিহাস না জানার কারণে নারী আজ সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত, অবাঞ্চিত এবং নির্যাতিত। পরিবার ও সমাজে শান্তি দেবার জন্য যে নারী সৃষ্টি সে নারীকে একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের দোহাই দিয়ে, পর্দার অজুহাতে, অশ্লীলতা থেকে রক্ষার নামে ফতোয়াবাজি করে মিথ্যে শরিয়তের বেড়াজালে বন্দী করে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে কিম্ভূতকিমাকার প্রানীতে পরিণত করে রেখেছে। চারদেয়ালের অন্ধকার কুঠিরে বন্দী করে রেখে না দিচ্ছে তাদের পৃথিবী সম্পর্কে জানতে, না দিচ্ছে তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে, না দিচ্ছে নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে। যে সমাজ, সংসার, জাতির শান্তির জন্য নারী সৃষ্টি, সে নারী আজ সমস্ত রকম অন্যায় অশান্তির মূল। এর প্রধান কারণ সমাজ যেমন জানেনা, তেমনি নারীও জানেনা তার সৃষ্টি রহস্য।

বিকৃত বিপরীতমুখী ইসলামের আলেম ওলামাগণ নারীদেরকে চান গৃহবন্দী করে রাখতে, তাদের মতে নারীকে যদি একান্তই বের হতে হয় তা আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত হয়ে।

পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি করা নারী

নারী স্বাধীনতা, সম-অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন মনোহর শব্দজালে নারীকে বন্দী করে পশ্চিমা ভোগবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কার্যত নারীকে পণ্যে পরিণত করেছে।

অন্যদিকে আরেকদল পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। তারা, কূপমন্ডুক ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে নারীকে রক্ষার কথা বলে, ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বের করে আনার কথা বলে, অধিকার ফিরিয়ে দেবার কথা বলে, স্বাধীনতা দেবার কথা বলে নারীকে অর্ধনগ্ন করে ভোগবিলাসের পণ্যে পরিণত করেছে। আর বোধশক্তিহীন নারীরাও স্বাধীনতা পেয়েছে ভেবে তাদের কথায় পুতুলের মতো নৃত্য করছে। স্রষ্টা কর্তৃক এত বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েও সস্তা পণ্যের মতো নিজেদের স্বত্তাকে বিসর্জন দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। একদিকে ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্যদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতি তারা নারীর প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা না জানার কারণে এভাবে নারীদের ভোগ্য পণ্যে রুপান্তর করে রেখেছে।

হেযবুত তওহীদের নারীরা

হেযবুত তওহীদের নারীরা এই দুই ধরণের অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়জীদ খান পন্নীর অনুসারী, তাঁর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত। ইসলাম যেমন ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা তেমনি এর সব কিছুতেই ভারসাম্য রয়েছে। কোনো কিছুতে বাড়াবাড়ি নেই। হেযবুত তওহীদের নারীরা কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী হিজাব করে। তারা পুরুষের পাশাপাশি সব কাজে অংশগ্রহণ করে। শহরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তারা তওহীদের বালাগ দিয়েছেন। তারা পত্রিকা বিক্রি করছে, সেমিনার করছে, আলোচনা সভা ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করছে, সাংবাদিকতা করছে, অফিসে কাজ করছে, চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে, পিঠা বিক্রি করছে, সব কাজে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে। মানবতার কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে তারা পুরুষের পাশাপাশি অনেক জেল জুলুমের শিকার হয়েছে। ধর্মব্যবসায়ীদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে নিজের ঘরবাড়ি ও সংসার থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। অনেকে স্বামী, সন্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন যেটা মহানবীর অনেক মহিলা সাহাবীদের বেলায়ও হয়েছিল। তারা মহামান্য এমামুয্যামানের আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতো, একসাথে সালাহ কায়েম করেতো। নিজেদের পার্থিব সম্পদ বিসর্জন দিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সত্যের আলো পৌঁছানোর জন্য, মানবজাতিকে এ অন্যায় অশান্তি থেকে মুক্তি দেবার জন্য হেযবুত তওহীদের নারীরা প্রতিনিয়ত পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে।

ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার নারী মুক্তির অন্তরায় শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হেযবুত তওহীদের সেমিনারে মোজাহেদারা...

হেযবুত তওহীদের নারীরা

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন হেযবুত তওহীদের নারীরা

মাননীয় এমামুযযামানের আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মোজাহেদারা...

সত্য প্রচারে জেল-জুলুমকেও হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে হেযবুত তওহীদের মোজাহেদারা...

হেযবুত তওহীদের নারীরা

সেমিনারে আগত অতিথিদের রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে...

হেযবুত তওহীদের প্রকাশনার স্টল সাধারণত মেয়েরাই করে থাকে...

বইমেলায় দাজ্জাল বই বিক্রি করছে মোজাহেদারা...

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত মোজাহেদা...

পত্রিকা বিক্রিতে হেযবুত তওহীদের মোজাহেদা...

চিকিৎসাসেবা প্রদান করছেন হেযবুত তওহীদের মোজাহেদা...

শিল্পী নচিকেতা

আর উপস্থাপক বাপ্পা

বিনোদন ডেস্ক:
একই অনুষ্ঠানে যে দু'জন পাশাপাশি বসে গল্প, গান চালিয়ে যাবেন; সে দু'জনেরই নাম খুব ভারী। বাংলা গানে তাদের অবদান অনেক। একজন নচিকেতা চক্রবর্তী, নব্বই দশকে যিনি বাংলা গানে ভিন্ন একটা ধারা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আরেকজন বাপ্পা মজুমদার, যার সুরে-কণ্ঠে-সঙ্গীতে বাংলা গান পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। তারা দু'জন এক হচ্ছেন 'নচিকেতা নাইটস'-এ। তবে বাপ্পা মজুমদার গান গাইতে এ অনুষ্ঠানে আসছেন না। উপস্থাপনার দায়িত্ব তার ওপর। এতে নিজের জনপ্রিয় কিছু গান গাইবেন নচিকেতা। সংক্ষিপ্ত আকারে তার জীবনের কিছু অংশ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রও দেখানো হবে অনুষ্ঠানে। 'নচিকেতা নাইটস' নির্মাণ করেছেন রুমানা হক। তিনি জানান, কয়েকমাস আগে নচিকেতা যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন এ অনুষ্ঠানটির দৃশ্যধারণ হয়েছিলো। রোজার ঈদে এটিএন বাংলায় প্রচার হবে 'নচিকেতা নাইটস'।

ইউটিউবে মাহির রেকর্ড

বিনোদন ডেস্ক:
মাহিয়া মাহির নতুন ছবি 'অগ্নি টু' মুক্তি পাবে ঈদে। তার আগে গত ৪ জুন ইউটিউবে উন্মুক্ত হয় এর গান 'ম্যাজিক মামনি'র ভিডিও। প্রথম ছয় দিনে এটি দেখা হয়েছে ৪ লাখ ৬১ হাজার ৪৮০ বার। বাংলাদেশের কোন নাটক, চলচ্চিত্র, গানের এমন রেকর্ড আর নেই। প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই গানটি নিয়ে সোরগোল পড়ে যায়। সর্বশেষ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, 'ম্যাজিক মামনি' দেখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬ লাখ ১৫ হাজার ১২৪। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন নেহা কাক্কার। এর কথা লিখেছেন কলকাতার গীতিকার ঋদ্ধি, সংগীত পরিচালনায় স্যাভি। গানটি অভাবনীয় সাড়া পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত মাহি। তিনি বলেন, 'আমি অভিভূত। একটা গান এতোটা সাড়া পাবে ভাবিনি। এজন্য দর্শক এবং ভক্তদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' জাজ মাল্টিমিডিয়া ও কলকাতার এসকে মুভিজ প্রযোজিত এবং ইফতেখার চৌধুরী ও ভারতের হিমাংশু পরিচালিত 'অগ্নি-টু' হলো গত বছর মুক্তি পাওয়া 'অগ্নি'র দ্বিতীয় কিস্তি। এতে মাহির পাশাপাশি অভিনয় করেছেন কলকাতার ওম, বলিউডের আশীষ বিদ্যার্থী প্রমুখ। ঈদের দিন দুই বাংলায় মুক্তি পাবার কথা আছে 'অগ্নি টু'র।

মোনা এবং লিসা দু'জনই প্রীতি!

বিনোদন ডেস্ক:
শুভ আর মোনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দু'জনই। দারুণ বন্ধুত্ব। তারা একে অপরের বড় আপন। কখনও কীটসের কবিতার লাইন বা রবি ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের তুলনা টেনে শুভর রোজকার কাজই ছিলো নতুন নাম দিয়ে মোনাকে আবিস্কার করা। মোনাও তাতে অসীম আনন্দে ভেসে যেতো। মোনাকে লিসা বলেও ডাকতো শুভ। অন্যত্র বিয়ে হওয়ার পর মোনাকে তার স্বামী লিসা বলেই ডাকে। গল্পটা 'অ্যাগনেস' নাটকের। এতে মোনা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানজিদা প্রীতি। আর শুভর ভূমিকায় আছেন ইন্তেখাব দিনার। মোনা ও বাদল দম্পতির মেয়ের নাম অ্যাগনেস। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই শুভ ও মোনা ঠিক করে তাদের মেয়ের নাম রাখবে অ্যাগনেস। তাই নাটকের নামও এটাই। এ নাটকেও আরও আছেন মাজনুন মিজান, পাপিয়া সরকার এবং শ্রেষ্ঠা। নাটকটি লিখেছেন বিপ্লব মজুমদার, পরিচালনায় রাকেশ বসু। তিনি বলেন, '২০০৮ সালে পরিকল্পনা ছিলো এই কাজটা করার। অনেক সময় লেগে গেলো এই জায়গা পর্যন্ত আসতে। লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসাকে দু'ভাগ করতে দাঁড়ায় মোনা আর লিসা। এ নাম দুটি রচয়িতা ব্যবহার করেছেন এতে।' ৯ ও ১০ জুন রেইন ট্রি প্রোডাকশন প্রযোজিত 'অ্যাগনেস' নাটকের দৃশ্যধারণ হয়েছে উত্তরায়। রোজার ঈদে একটি টিভি চ্যানেলে প্রচার হবে এটি।

শান্তির বার্তা নিয়ে নেমে আসা পরী

বিনোদন ডেস্ক:
সে ছিলো স্বর্গলোকে। নেমে এলো বাংলাদেশে। রঙিন গাউন, চুলে হরেক ফুল গুঁজে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময়। তার একটাই লক্ষ্য- শান্তি বিরাজ করানো। তবে সবখানে এই পরীর সাক্ষাৎ মিলবে না। তাকে দেখা যাবে শুধু টিভি পর্দায়। কারণ এটা বাস্তব ঘটনা নয়, নাটকের কাহিনী। এতে পরীর বেশে হাজির হয়েছেন কুসুম সিকদার। আর যার মাধ্যমে পরী শান্তি ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন, তিনি আনিসুর রহমান মিলন। পেশায় লেখক। সকাল আহমেদের 'সাক্ষাৎকার প্রার্থী' নাটকে একসঙ্গে দেখা যাবে তাদেরকে। ১৪ জুন থেকে এর দৃশ্যধারণ শুরু হয়েছে। নাটকটি প্রচার হবে রোজার ঈদে।

কনকচাঁপার ‘এই সুন্দর ফুল’ ও ‘পদ্মপুকুর’

বিনোদন ডেস্ক:
মাহে রমজান উপলক্ষে ইসলামী গানের একক অ্যালবাম বের করলেন কনকচাঁপা। নাম ‘এই সুন্দর ফুল’। আর রোজার ঈদে প্রকাশ হবে জনপ্রিয় এই কণ্ঠশিল্পীর গাওয়া আধুনিক গানের একক অ্যালবাম ‘পদ্মপুকুর’। ‘এই সুন্দর ফুল’-এ স্থান পেয়েছে মোট সাতটি হামদ ও নাত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ‘আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান’, ‘মোহাম্মদের নাম জপেছিলে’,‘তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার’, ‘এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল’ প্রভৃতি। এদিকে ‘পদ্মপুকুর’-এর সব গানের সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন মঈনুল ইসলাম খান। ইসলামী গানের অ্যালবামের মতো এটিও বাজারে আনবে লেজার ভিশন। এদিকে মাহে রমজান উপলক্ষে লেজার ভিশন বাজারে এনেছে আরও কয়েকটি হামদ ও নাত, ইসলামী গান এবং কাওয়ালী গানের অডিও-ভিডিও অ্যালবাম। এগুলো হলো- রাফাতের কাওয়ালি গানের অডিও-ভিডিও অ্যালবাম ‘আল্লাহ তুমি দয়াময়’, ওবায়দুর রহমানের হামদ ও নাতের অডিও অ্যালবাম ‘ত্রাণ করো মাওলা’, আপন আহসানের ইসলামী গানের অডিও অ্যালবাম ‘ভাবো আরেকবার’, ঝন্টু আর্ট প্রোডাকশন প্রযোজিত হামদ ও নাতের মিশ্র অডিও অ্যালবাম ‘আল্লাহ রাহমানুর রাহিম’ (এতে কণ্ঠ দিয়েছেন রওশনা আরা মুস্তাফিজ, জিনাত রেহানা, খালিদ হোসেন, এম.এ. মান্নান, ফেরদৌসি রহমান, রাহাত আরা গীতি-সহ অনেকে), হামদ ও নাতের মিশ্র অডিও অ্যালবাম ‘তোমার করুণা যতো’ (এতে কণ্ঠ দিয়েছেন এম.এ. মান্নান, ইসমত আরা, সোহরাব হোসেন, বশীর আহমেদ, সৈয়দ আব্দুল হাদী, সালাউদ্দিন আহমেদ, শাম্মী আক্তারসহ অনেকে)।

শখকে নিয়ে সিকান্দার বক্স এবার রাঙামাটি

বিনোদন ডেস্ক:
ঈদ এলেই সিকান্দার বক্সকে দেখা যাবে, গত কয়েক বছর ধরে এটা মোটামুটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমদিকে তিনি ঢাকাতেই স্থির ছিলেন। পরবর্তীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন বান্দরবান, কক্সবাজার। এবার যাচ্ছেন রাঙামাটি। নামও তাই দেওয়া হয়েছে ‘সিকান্দার বক্স এখন রাঙামাটি’। ১৩ জুন সকাল থেকে দৃশ্যধারণ শুরু হয়েছে। তবে রাস্তা-ঘাটে নয়, বাড়িতেও নয়; শুটিং হচ্ছে বাসে। পুরো ইউনিটের জন্য নেওয়া হয়েছে গোটা একটি বাস। ঢাকা টু রাঙামাটি যেতে যেতে বাসেই কিছুটা দৃশ্যায়ন চলবে। রাঙামাটিতেই হবে বাকিটা। যাকে ঘিরে এতো আয়োজন, সেই মোশাররফ করিম ছাড়াও সঙ্গে রয়েছেন তানিয়া আহমেদ, ফারুক আহমেদ, রোবেনা রেজা জুঁই, আহসান কবির প্রমুখ। এবার কিন্তু সিকান্দার বক্সের বউ বদল হয়নি। সারিকা, তিশা, প্রভা, মোনালিসা ঘুরে ঠেকেছে আনিকা কবির শখেই। সিক্যুয়েলের গত পর্বেও ছিলেন শখ। রাঙামাটি যাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন তিনিও। সাগর জাহানের রচনা ও পরিচালনায় ছয় পর্বের ধারাবাহিকটি প্রচার হবে রোজার ঈদে, বাংলাভিশনে।

মৌ-নোবেলের 'লাভ ফাইনালি'

বিনোদন ডেস্কঃ

নোবেল ও সাদিয়া ইসলাম মৌ হলেন দর্শকের স্বপ্নের জুটি। চার বছর পর আবার একফ্রেমে হাজির হতে যাচ্ছেন তারা। আসন্ন রোজার ঈদের একটি নাটকে অভিনয় করেছেন দু'জনে। নাম 'লাভ ফাইনালি'। লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন কৌশিক শংকর দাশ। এখানে নোবেলকে ঈষান ও মৌকে দেখা যাবে নন্দিনী চরিত্রে। গল্পে ঈষান

সংগীত পরিচালক। আর নন্দিনী পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার। দীর্ঘ আট বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক তাদের মধ্যে। কিন্তু দু'জনই ক্যারিয়ার গড়া নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলো যে এই সম্পর্কটাকে উপেক্ষা করেছে। বন্ধুরা বারবার জোর করলেও বিয়ে করার কথা তারা একেবারেই ভাবার সময় পায়নি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তিক্ততা এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তারা এই সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর শুরু হয় নতুন ঘটনা। উত্তরা ও ধানমন্ডির বিভিন্ন জায়গায় এরই মধ্যে নাটকটির চিত্রায়ন হয়েছে। 'লাভ ফাইনালি' প্রচার হবে আরটিভিতে। নাটকটি নিয়ে নির্মাতা কৌশিক বলেন, 'তিন বছর আগে এ নাটকের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু নানা কারণে করা হয়নি। অবশেষে নোবেল ও মৌকে এক ফ্রেমে তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। কাজটি করায় তাদেরকে ধন্যবাদ।'

বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা

বিনোদন ডেস্কঃ

ভারতীয় সিনেমার আগের সব রেকর্ড পিছনে ফেলে নতুন ইতিহাস লিখতে চলেছে বলিউড। এসএস রাজামউলির পরিচালনায় বহুল আলোচিত এই সিনেমার নাম 'বাহুবলি-- দ্য বিগিনিং'। ছবিটিতে খরচ হয়েছে ২২০ কোটি রুপি। যা এখনও পর্যন্ত বলিউডে রেকর্ড। আগামী ১০ জুলাই ছবিটির হিন্দি সংস্করণ মুক্তি পাবে। 'বাহুবলি-- দ্য বিগিনিং' একই সঙ্গে মুক্তি পাবে তামিল ও তেলুগু ভাষায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে হিন্দি, ইংরেজি, মালায়ালাম ও ফরাসি ভাষায় ডাবিং হয়েছে। ছবির হিন্দি সংস্করণ প্রযোজনা করবে করণ জোহারের সংস্থা, ধর্ম প্রোডাকশনস। ছবি কতটা সাফল্য পাবে, তা ভবিষ্যতই বলবে, কিন্তু ট্রেলারেই মালুম হচ্ছে, প্রযুক্তির দিক থেকে 'বাহুবলি-- দ্য বিগিনিং' সব নজির ছাপিয়ে যাবে। ভারতীয় পুরাণের উপর তৈরি চিত্রনাট্যের এই ছবিতে অত্যাধুনিক Arri Alexa XT ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যা হলিউডের খুব বড় বাজেটের ছবিতেই ব্যবহৃত হয়।

সেলিব্রেটি ক্রিকেট ফেস্টিভ্যাল

বিনোদন ডেস্কঃ
তারকাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সেলিব্রেটি ক্রিকেট ফেস্টিভ্যাল হবে ঈদের ছুটিতে। রোজার ঈদের দিন থেকে ছয় দিন জিটিভিতে রোজ প্রচার হবে এই আয়োজন। ৬ জুন রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সেলিব্রেটি ক্রিকেট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করবে ছয়টি দল। প্রত্যেক দলে আট জন করে নিয়মিত খেলোয়াড় এবং চারজন বিকল্প খেলোয়াড় থাকবেন। নিয়মিত আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে থাকবেন সাত জন টিভিশিল্পী এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অথবা সাবেক খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন। নারী-পুরুষ উভয় খেলোয়াড়ই থাকবেন প্রতিযোগী দলগুলোতে। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে ছয়টি দল মোট ১৫টি লিগ ম্যাচ খেলবে। এর মধ্যে থেকে ২টি সেমিফাইনাল ও ১টি ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে জানানো হয়, ঈদে দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দিতে এই আয়োজন। এখানে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় রকিবুল হাসান, স্পোর্ডিয়ামেরসিএফ ও সালমা আদিল, প্রাণের চীফ মার্কেটিং অফিসার জি.এম কামরুল হাসান। সালমা আদিল বলেন, 'ক্রিকেট আমাদের গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। আমাদের বিনোদন অঙ্গনের শিল্পীরা সবসময় মাঠে কিংবা টিভিতে ক্রিকেট উপভোগ করেন। তাই আমরা তাদের এবং ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে এ উৎসবের আয়োজন করছি। আমার বিশ্বাস, ঈদে এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সমাদৃত আয়োজন হয়ে উঠবে।' সেলিব্রেটি ক্রিকেট ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন কামরুল হাসান। রকিবুল হাসান বলেন 'টিভি শিল্পী বরাবরই ক্রিকেট দলকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। এই উৎসবের মাধ্যমে ক্রিকেট ও টিভি তারকাদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি হবে।'

'চাখোর', 'পানখোর' এবং 'ঝালখোর' এর পর এবার ঘুষখোর মোশাররফ!

বিনোদন ডেস্কঃ
এতোদিন চা, পান অনেক কিছুই খেয়েছেন। শুধু খেয়েছেন বলে থেমে গেলে, তার স্বভাবটা ঠিকঠাক বোঝানো যাবে না। এমনই তার খাওয়ার বহর, রীতিমতো রেকর্ড হয়ে যাওয়ার মতো। সেই ব্যক্তি এবার আসছেন ঘুষ খেতে। কে তিনি? 'চাখোর', 'পানখোর' ও 'ঝালখোর' তিনটি কিস্তিই দারুণভাবে জনপ্রিয় তার কারণে। তিনি মোশাররফ করিম। তাকে দিয়ে এবার ঘুষ খাওয়ানোর পরিকল্পনা ফেঁদেছেন নির্মাতা মারুফ মিঠু। নির্মাণ করছেন 'সেই রকম ঘুষখোর'। ২৯ জুন গাজীপুরের পুবাইলে

নাটকটির দৃশ্যধারণ শুরু হবে। তবে বরাবরের মতো এ কিস্তিতে এসে মোশাররফের নায়িকা বদলে যাচ্ছে। আসছেন রিচি সোলায়মান। এর আগের তিনটি কিস্তিতে অভিনয় করেছিলেন অর্ষা, নাদিয়া ও ভাবনা। চিত্রনাট্য লিখছেন আশরাফুল চনচল। ঈদে বাংলাভিশনে প্রচার হবে নাটকটি।

মজার সব রান্না-বান্না

ইফতারির সাধারণ ছোলাতেই নিয়ে আসুন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী স্বাদ খুব সহজ রেসিপিতে!

কমারি ডেস্কঃ

ছোলা বা বুট ইফতারির মেন্যুর সবচাইতে পরিচিত আইটেম। প্রতিদিন আলুর চপ বা বেগুনী ধরণের ফেতারের আইটেম করা না হলেও ছোলা বুট ঠিকই তৈরি করা হয় প্রায় প্রতিটি ঘরেই। তবে রমজান মাসের তিদিনকার ইফতারের এই সাধারণ ছোলাতেই খুব সহজে ভিন্ন স্বাদ নিয়ে আসা যায়। আজকে শিখে নিন বেই সহজ রেসিপিটি।

উপকরণঃ

- ১ কাপ ছোলা
- ১/৪ কাপ পেঁয়াজ কুচি
- ২ টি টমেটো কিউব করে কাটা
- ২ টি কাঁচামরিচ কুচি
- ৩ টেবিল চামচ তেল
- ২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
- ১ চা চামচ জিরা গুঁড়ো
- আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়ো
- আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
- দেড় চা চামচ লেবুর রস
- ১ চা চামচ আদা-রসুন বাটা
- আধা চা চামচ গরম মসলা গুঁড়ো
- লবণ স্বাদমতো
- ১ চিমটি বিট লবণ
- ধনে পাতা কুচি ইচ্ছে

পদ্ধতি:

- প্রথমেই স্বাভাবিক ভাবেই ছোলা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন সারারাত। এতে ছোলা ফুলে উঠবে। এরপর বুট সামান্য লবণ ও হলুদগুঁড়ো দিয়ে সেদ্ধ করে নিন ভালো করে।
- এরপর চুলায় প্যানে তেল দিয়ে গরম করে এতে দিন আদা-রসুন বাটা। একটু লালচে হয়ে ঘ্রাণ ছড়ালে এতে দিন পেঁয়াজ কুচি।
- পেঁয়াজ কুচি নরম হয়ে এলে বাকি সকল মসলা একে একে প্যানে দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে মসলা কষাতে থাকুন। মসলা কষে এলে এতে টমেটো কুচি দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিন এবং ছোলা ঢেলে দিন।
- ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিন পুরো মসলার সাথে এবং ঝোল শুকিয়ে মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন।
- মাখা মাখা ধরণের হয়ে এলে এতে দিন লেবুর রস। ভালো করে নেড়ে উপরে ধনে পাতা কুচি ছিটিয়ে নামিয়ে নিন। ব্যস, তৈরি আপনার ভিন্ন স্বাদের ইফতারির আইটেম ছোলা।

সর্ষে ইলিশ নয়, এবার সর্ষে মুরগির রেসিপি

রকমারি ডেস্ক:
সর্ষে দিয়ে ইলিশ মাছ তো খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার। কিন্তু সর্ষে দিয়ে মুরগী? হ্যাঁ, সেটা রাঁধা যায় বৈকি, তবে রেসিপিটা বলাই বাহুল্য যে একটু ভিন্ন। অবসরে এই ভিন্নরকম মাংস রান্না পরিবারকে খাওয়াতে চাইলে জেনে নিন দারুণ এই রেসিপি।

উপকরণ:
মুরগী–৬/৭ টুকরো
পেঁয়াজ–১ টা (বড়)
রসুন–২/৩ কোয়া
আদা–২ ইঞ্চি
হলুদ গুঁড়া–১/৩ চামচ
মরিচ গুঁড়া–১/২ চা চামচ
কালো সরিষা–১/২ চা
চামচ তেল –৩ টেবিল চামচ (চাইলে সয়াবিন তেলের সাথে সরিষার তেল মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন)
লবণ স্বাদ মত।

প্রণালি:
-পেঁয়াজ, রসুন, আদা আর সরিষা এক সাথে বেটে নিতে হবে। প্যানে তেল দিয়ে মরিচ আর হলুদ গুঁড়া দিয়েই মুরগীর টুকরো গুলো দিয়ে হাল্কা ভাজতে হবে।
-এরপর বেটে রাখা মশলা আর লবণ দিয়ে কষাতে হবে। কষানো হয়ে গেলে অল্প গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
-ঢাকনা খুলে দেখে নিতে হবে যাতে প্যানে লেগে না যায়। প্রয়োজনে আবার একটু গরম পানি দিয়ে সেদ্ধ হওয়া অব্দি রান্না করতে হবে।
-মাখা মাখা মশলা থাকতে নামিয়ে ফেলতে হবে। আপনি চাইলে নামানোর আগে কিছু আস্ত কাঁচা মরিচ ছেড়ে দিতে পারেন সুঘ্রাণের জন্য।

গ্যাসের চুলা কিংবা ওভেনে, "পারফেক্ট" কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধার সবচাইতে সহজ রেসিপি!

রকমারি ডেস্ক:
ভীষণ সুস্বাদু কাচ্চি বিরিয়ানি কি কেবল কয়লার চুলাতেই হয়? আপনি চাইলে গ্যাসের চুলা কিংবা ওভেনেও খুব সহজে রেঁধে ফেলতে পারবেন "পারফেক্ট" কাচ্চি বিরিয়ানি। হ্যাঁ, যত বড় রাঁধুনিই হোন না কেন, কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধা একটু কঠিনই বটে। তবে আজ এমন একটি রেসিপি আপনাদের জন্য দেয়া হলো, যেটা দিয়ে যে কেউ রাঁধতে পারবে কাচ্চি বিরিয়ানি। আর সেই কাচ্চি বিরিয়ানি হবে একদমই পারফেক্ট রেস্তরাঁর স্বাদ! বিশ্বাস না হলে একবার চেষ্টা করেই দেখুন এই রেসিপিটি।

উপকরণ:
খাসির মাংস –২ কেজি
পোলাও এর চাল –১ কেজি
আলু –আধা কেজি
পেঁয়াজ স্লাইস ১–কাপ
আদা বাটা –২ টেবিল চামচ
রসুন বাটা –১ টেবিল চামচ
জিরা গুঁড়া –১ টেবিল চামচ
লাল শুকনা মরিচ গুঁড়া –৫ টা
ঘি –১কাপ + আধা কাপ তেল
টক দই –দেড় কাপ
এলাচি বাটা –১ চা চামচ
দারচিনি বাটা –আধা চা চামচ
লবঙ্গ গুঁড়া –৪ টা
জায়ফল গুঁড়া–১ টা
জয়ত্রি গুঁড়া –আধা চা চামচ
কমলা রং (ইচ্ছা)
গোলাপজল –২ টেবিল চামচ
কেওড়াজল –২ টেবিল চামচ
জাফরান –আধা চা চামচ
আলুবোখারা –১০ টা
গুঁড়া দুধ –৩ টেবিল চামচ

প্রণালি:

-মাংস ধুয়ে লবণ মেখে রাখতে হবে ১ ঘন্টা।

-চুলায় গরম পানি বসিয়ে রাখবেন। পেঁয়াজ কেটে ভেজে রাখতে হবে। আলুতে হালকা রং মেখে তেলে ভেজে রাখতে হবে। চাল ধুয়ে পানি ঝড়িয়ে রাখবেন।

-এবার আলু ও ঘি ছাড়া সব উপকরণ একসাথে মাংসের সাথে মিশাতে হবে।

-এই ফাঁকে ওভেন প্রি হিট হতে দিয়ে দেবেন।

-তারপর যে পাত্রে রান্না করা হবে (স্টিলের পাত্র হলে ভালো হয়) সে পাত্রে প্রথমে অর্ধেক মাংস বিছিয়ে দিতে হবে, তার উপর আলু ছড়িয়ে দেবেন। তারপর অর্ধেক চাল ছড়িয়ে দিবেন।

এভাবে আবার মাংস ও চাল দেবেন। সবশেষে ঘি এর সাথে অল্প গরম পানি, দুধ, মিশিয়ে ছড়িয়ে দিবেন। চালের সমান গরম পানি দেবেন।

-লবণ ঠিক আছে কিনা দেখবেন। ভাল করে ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ ওভেন ১৮০ ডিগ্রী তে ২ ঘন্টা বেক করবেন । ১ ঘন্টা পর তাপমাত্রা ১৫০ ডিগ্রীতে কমিয়ে নিয়ে আসবেন।

-বেক করার পর ১৫ মিনিট স্ট্যান্ডইং সময় দিন। এরপর পরে ঢাকনা খুলে পরিবেশন করুন।

-চুলায় করতে চাইলে আঁচ একদম কমিয়ে জ্বালে বসিয়ে দিন। ১ ঘন্টা পর নিচে তাওয়া দিয়ে দিন। হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দিয়ে ময়দার খামির দিয়ে মুখ আটকে দেবেন। ২ ঘন্টা পর পরিবেশন করুন।

মুস্তাফিজুর রহমান সূচনাতেই বিস্ময়

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে মুস্তাফিজদের বাড়ি। বাবা আবুল কাশেম গাজী, মা মাহমুদা খাতুন। চার ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট মুস্তাফিজ। কোনো ডাক নাম নেই তার। বড় ভাই মুখলেস বলেন, 'নাম ওর একটাই, মুস্তাফিজ।' ছোট বেলা থেকেই বাঁ-হাতি তিনি। এমনকি প্রথম প্রথম নাকি ভাতও খেতেন বাঁ হাতেই। অনেক চেষ্টায় এই অভ্যাসটি পাল্টানো গেছে তার। ছোটবেলা থেকে বাবা-মা

আর বড়দের খুব মেনে চলতেন তিনি। খেলতে নামার আগেও ভোলেননি এই আদব-কায়দা। ফোন করে বাবা-মা, বড় ভাই, স্থানীয় মুরব্বি ও কোচদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সবার দোয়া ও আশীর্বাদ নিয়েই খেলতে নামেন তিনি।

বড় ভাই মোখলেসুরের হাত ধরেই প্রথম খেলার মাঠে আসা মুস্তাফিজের। পড়াশোনায় অতটা মন তার কখনোই ছিল না। বাসায় তো বলেই দিয়েছিলেন, "আমার দ্বারা ওসব হবে না। তোমরা আর জোর করো না।" এর পর থেকে ক্রিকেটই তার ধ্যানজ্ঞান। বড়েয়া মিলনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নেট প্র্যাকটিস করতেন মুস্তাফিজ। তার তত্ত্বাবধান করতেন স্থানীয় কোচ আলতাফ। আলতাফই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন মুস্তাফিজের ভেতরের 'ধারটা'। হিরে চিনে নিয়ে ঘষামাজার কাজটি তিনি শুরু করে দেন সেই তখন থেকেই। সকলের পরিশ্রমের প্রতিদান দিতে পেরেছেন মুস্তাফিজ। ভারতের বিপক্ষে খেলা সদ্যসমাপ্ত সিরিজের ম্যাচগুলোতে তার পারফরম্যান্সই বলছে সে কথা।

জেলা পর্যায়ে মুস্তাফিজ

এই তো বছর পাঁচেক আগের কথা। জেলা পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট খেলায় সাতক্ষীরার হয়ে প্রথম মাঠে নেমেছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান। প্রতিপক্ষ মাগুরা জেলা দল। প্রথম দিনই আগুন ঝরল তার বলে। পেলেন দুই উইকেট। খেলা চলাকালে স্থানীয় কোচ আলতাফ হোসেন ফোন করে মুস্তাফিজের বড় ভাই মোখলেসুর রহমানকে বাগেরহাটে ডেকে নেন। আলতাফ ফোনে বলেন, মুস্তাফিজ দারুণ খেলছে। তাঁকে আসতেই হবে। মাঠে বসে মোখলেসুরও দেখলেন ছোট ভাইয়ের দুর্দান্ত বোলিং। দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি।

মুস্তাফিজের তখন আবদার ছিল একজোড়া নতুন জুতার। বড়ো ভাই মোখলেসুর কথা দিলেন, পরের ম্যাচে তিন উইকেট নিতে পারলে ছোট ভাইটির আবদার পূরণ করা হবে। মুস্তাফিজ তার নিশানা ভেদ করলেন। কুষ্টিয়ার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে ঝোলায় পুরলেন তিন উইকেট। মোখলেসুর পরদিন সানন্দে খুলনা শহর থেকে মুস্তাফিজকে কিনে দেন একজোড়া স্পাইক বুট। মুস্তাফিজের আনন্দ যেন আর ধরে না।

বয়সভিত্তিক এই জেলা পর্যায়ের টুর্নামেন্টটির বাছাই পর্বেই ঘটেছিল বেশ মজার এক ঘটনা। মোখলেসুরের বাইকে চেপে সাতক্ষীরার সরকারি কলেজ মাঠে বোলিংয়ের পরীক্ষা দিতে এসেছেন মুস্তাফিজ। মুস্তাফিজ একা নন, এসেছে আরও অনেক উঠতি তরুণ। আশঙ্কায় খানিকটা কুঁকড়ে গেলেন তিনি। তার মনে হয়েছিল, এত প্রার্থীর ভিড়ে পরীক্ষাই বুঝি দিতে পারবেন না। অবশেষে পালা আসে তার। কিন্তু হালকা টেনিস বলে খেলে অভ্যস্ত মুস্তাফিজ কাঠের বল হাতে প্রথমেই ঘটালেন বিপত্তি। প্রথম কয়েকটি বল ঠিকঠাক মতো পিচেই ফেলতে পারলেন না। দৌড়ে এলেন বড় ভাই মোখলেস। খানিকক্ষণ সাহস দিলেন ছোট ভাইকে।

তারপর আর পিছু ফেরা নয়। একের পর এক দুর্দান্ত বল করে তিনি তাক লাগিয়ে দিলেন নির্বাচকদের। একদম পাকিস্তানের বিপক্ষে গত টি-টোয়েন্টি ম্যাচটার মতোই। সেদিন অভিষেক ম্যাচের প্রথম ওভারেই মাশরাফি বল তুলে দিলেন তার হাতে। আর প্রথম বলেই ওয়াইড। কিন্তু তারপরেই তো হয়ে উঠলেন বিস্ময়! চার ওভারের স্পেলে ডট বলই ষোলটা। অধিনায়ক আফ্রিদির দাবিমতো টি-টোয়েন্টি 'স্পেশালিস্ট' দলটির বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্স তো বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না

তেঁতুলিয়া গ্রাম থেকে সাতক্ষীরা শহরের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। প্রায় প্রতিদিনই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে প্র্যাকটিসে যেতেন মুস্তাফিজ। বড় ভাই মোখলেসুর, স্থানীয় কোচ আলতাফ ও জেলা কোচ তপু ভাইয়ের নিয়মিত পরিচর্যায় মুস্তাফিজ শানিয়ে নিতে থাকেন নিজের ধার। যেই ধারের কাছে কচুকাটা হতে থাকে প্রতিপক্ষের একের পর ব্যাটসম্যান। জেলা পর্যায়ের পর খুব বেশি দিন তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। ডাক পেয়ে যান খুলনার বিভাগীয় দলে খেলার জন্য।

বছর তিনেক আগে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ফাস্ট বোলিং ক্যাম্পে ট্রায়াল দিতে এসে কোচরা আর ছাড়েননি এই প্রতিভাকে। নিয়মিতই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলেছেন। বল করতেন জাতীয় দলের নেটেও। গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও আলো ছড়িয়েছিলেন এই পেসার। পেয়েছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নয় উইকেট। গত বছরের মে মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশ 'এ' দলেও স্থান পেয়েছিলেন মুস্তাফিজ। সেসময় তো সবাইকে রীতিমতো চমকে ছিলেন তিনি। প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ তখন সংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন, "অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সেরা বোলার সে। হয়তো খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি। তবে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের বাঁ-হাতি পেসারও দরকার।"

মুস্তাফিজ প্রথম শ্রেণিতে খেলা শুরু করেন গত বছর এপ্রিলে। এই তো ছয় মাস আগে অভিষেক হয়েছে ঘরোয়া একদিনের ম্যাচে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খুলনার হয়ে মাত্র আট ম্যাচ খেলেই পেয়েছেন ২৩ উইকেট। গড় ১৮.৯১, ইকোনমিক রেট ২.৬৮। আর লিস্ট এ-তে আবাহনীর পক্ষে ৫ ম্যাচে উইকেট ১২টি। গড় মাত্র ১১.৭৫, ইকোনমিক রেট ৩.৪৫।

জাতীয় দলে মুস্তাফিজ:

বাংলাদেশ জাতীয় দলে তার শুরুটা হয়েছিল দ্যুতিময়। গত ২৪ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে সফরকারী পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একমাত্র টুয়েন্টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ঘটে তার। আন্তর্জাতিক এই অভিষেক ম্যাচে তো রীতিমতো কাঁপন ধরিয়ে দিলেন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের। প্রথম ২ ওভারে দিয়েছিলেন মাত্র ৪ রান। পুরো স্পেল শেষে ২০ রান খরচ করে নিয়েছেন দুইটি উইকেট। সাজঘরে ফিরিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি ও মোহাম্মদ হাফিজের মতো দু'জন ব্যাটসম্যানকে।

তারই কিছুদিন পর গত ১৮ জুন সফরকারী ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে তার আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটের অভিষেক ঘটে। আর অভিষেক ম্যাচেই ৫ উইকেট লাভ করে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হওয়া এবং তারপরের ম্যাচেও মাত্র ৪৩ রান খরচায় ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়ই কউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। সর্বশেষ তৃতীয় ম্যাচটিতে যখন বাংলাদেশী বোলাররা দারুন উইকেট খরায় ভুগছিলেন, তখনও তিনি তুলে নেন গুরুত্বপূর্ণ দুইটি উইকেট। অভিষেক সিরিজের তিন ম্যাচ মিলিয়ে তার নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১৩ টি উইকেট। পরপর দুই ম্যাচে ম্যাচসেরা হওয়া মুস্তাফিজুরকে সিরিজসেরা ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে তাই বেগ পেতে হলো না।

২১ জুনের ম্যাচ শেষে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকারে টাইগার দলের এই তরুণ বাঘ বলেছিলেন, দেশের জন্য কিছু করতে চাই। তাইতো নিজের ক্যারিয়ারে আলো ছড়ানোর সাথে সাথে তিনি দেশের ক্রিকেটকেও করেছেন সমৃদ্ধ।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫টি, পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩টি ও ভারতের বিপক্ষে ২টি জয় নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়ানডে ক্রিকেট র‍্যাংকিং -এ অবস্থান সাত। ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। আর এ অর্জনের পেছনে মাশরাফি-মুশফিক-তামিমদের সাথে মুস্তাফিজের অবদানও উল্লেখযোগ্য তা নিশ্চই সকলেই মানবেন।

ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে অভিষেক ম্যাচে এখন পর্যন্ত মোট ১০জন বোলার পাঁচ উইকেট নেওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তার মধ্যে দু'জনই বাংলাদেশ দলের। তাসকিন আহমেদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান। বলে রাখা ভালো, দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ ছিলো ভারত!

বাংলাদেশের যত সিরিজ জয়

ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতে নিজেদের ১৮তম সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতকে ৭৯ রানে হারানোর পর ২১ জুন সফরকারীদের ছয় উইকেটের ব্যবধানে হারায় টাইগাররা। এর মধ্য দিয়ে মাশরাফিরা এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওয়ানডে সিরিজ জিতে নেয়। শেষ ম্যাচটি অবশ্য প্রত্যাশিত জয় এনে দিতে পারে নি। ৭৭ রানের হার নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয় টাইগারদের।

ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়ার পর বাংলাদেশ দল প্রথম দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ খেলে ১৯৯৯ সালে। ঢাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ওই ম্যাচে ১৫২ রানে হার মানে বাংলাদেশ। এরপর দেশ ও দেশের বাইরে জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলে বাংলাদেশ। তবে সিরিজ জয়ের সুযোগ তখন তৈরি করতে পারেনি টাইগাররা।

বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয় ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে। সেবার পাঁচ ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ঢাকায় আসে জিম্বাবুয়ে। ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ জিতে নেয় ৩-২ ব্যবধানে। প্রথম চার ম্যাচ শেষে ২-২ সমতায় থাকে সিরিজ। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী শেষ ম্যাচে আট উইকেটে জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দিয়ে সিরিজ জয় করে টাইগাররা।

২০০৬ সালে কেনিয়াকে ৪-০ তে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে চার ম্যাচের সিরিজ ৩-১ এ জেতে টাইগাররা। দেশের বাইরে এটিই বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয়। ওই বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আসে জিম্বাবুয়ে। তবে, প্রতিটি ম্যাচে হেরে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়ে দেশে ফিরে সফরকারীরা। ডিসেম্বরে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ দল দেশ ও দেশের বাইরে তিনটি সিরিজ জেতে।

এরপর ২০০৮ সালে আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ (৩-০) করে বাংলাদেশ। প্রতিটি ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জেতে স্বাগতিকরা।

২০০৯ সালেও তিনটি সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে দু'টি সিরিজেই জয় পায় বাংলাদেশ। ওই বছরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ৩-০ তে স্বাগতিকের হোয়াইটওয়াশ করে সাকিব আল হাসানের দল।

২০১১ সালে নিউজিল্যান্ডকে বাংলাওয়াশ (৪-০) করে মুশফিক বাহিনী। পরের বছর একটি সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। ক্রিস গেইলের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ হারায় ৩-২ ব্যবধানে।

২০১৩ সালের অক্টোবরে ঘরের মাঠে আবারও কিউইদের বাংলাওয়াশের লজ্জা দেয় টাইগাররা। কাইল মিলসের নিউজিল্যান্ড টাইগারদের কাছে সিরিজ হারে ৩-০ ব্যবধানে।

২০১৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়েকে ষষ্ঠ বারের মতো সিরিজ হারায় বাংলাদেশ। এবার ৫-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয় সফরকারীরা।

এরপর ২০১৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানকে রীতিমতো বলে কয়ে হোয়াইটওয়াশ (৩-০) করে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ভারতের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে ক্রিকেটে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান ঘোষণা করল টাইগাররা। এ নিয়ে টানা তিনটি সিরিজ জিতল বাংলাদেশ।